অধ্যায় ৫ মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া
Human Physiology : Respiration & Breathing

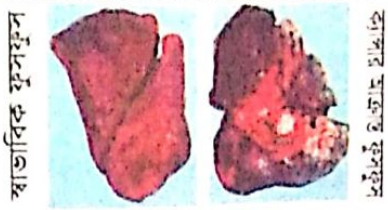

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- অ্যালভিওলাই
- প্লিউরা
- শ্বাসরন্ধ্রক
- ওটাইটিস মিডিয়া
- সাইনুসাইটিস
- কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস

আমাদের দেহে বায়ুর সাথে যে O_2 শ্বসন অঙ্গে প্রবেশ করে তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে টিস্যুকোষে পৌঁছায়। এ O_2 টিস্যুকোষে সঞ্চিত খাদ্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনকে সচল রাখে। উপজাত হিসেবে তৈরি করে CO_2 ও পানি। CO_2 রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে শ্বসন অঙ্গের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুকে জারিত করে খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিরূপে মুক্ত করে এবং উপজাত পদার্থ হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে তাকে শ্বসন বলে। এ অধ্যায়ে শ্বসন প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❐ মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক নির্ণয়	পাঠ ১	মানব শ্বসনতন্ত্র
❐ ব্যবহারিক : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন	পাঠ ২	ব্যবহারিক: মানুষের ফুসফুসের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ
❐ মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	পাঠ ৩	প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ
❐ রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহনের ব্যাখ্যা	পাঠ ৪	গ্যাসীয় পরিবহন : O_2 পরিবহন
❐ শ্বসন রঞ্জকের ভূমিকা	পাঠ ৫	গ্যাসীয় পরিবহন : CO_2 পরিবহন
❐ শ্বাসনালির রোগ সংক্রমণের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার	পাঠ ৬	শ্বাসরন্ধ্রক
❐ একজন ধূমপায়ী ও একজন অধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের মধ্যে তুলনা	পাঠ ৭ ও ৮	শ্বাসনালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার: সাইনুসাইটিস, ওটাইটিস মিডিয়া
❐ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা হিসেবে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য	পাঠ ৯	ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা
	পাঠ ১০	কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস

মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Human Respiratory System)

মানুষের শ্বসন অঙ্গ হচ্ছে একজোড়া **ফুসফুস** (lungs)। যে পথ দিয়ে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে তা বহির্গত হয় তাকে **শ্বসন পথ** (respiratory passage) বলে। **সম্মুখ নাসারন্ধ্র** থেকে শ্বসন পথের শুরু। মানুষের শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে নিচে বর্ণিত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়।

মানুষের শ্বসনতন্ত্র

ক. বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল	খ. বায়ু পরিবহন অঞ্চল	গ. শ্বসন অঞ্চল
সম্মুখ নাসারন্ধ্র, নাসাগহ্বর, পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র, নাসাগলবিল, স্বরযন্ত্র।	ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাই, প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল।	শ্বসন ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলার নালি, অ্যাট্রিয়াম, অ্যালভিওলার থলি, অ্যালভিওলাস।

নিচে মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ বর্ণনা করা হলো–

ক. বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল

১. সম্মুখ নাসারন্ধ্র (Anterior Nostrils): নাকের সামনে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি ছিদ্রকে সম্মুখ নাসারন্ধ্র বলে। নাক একটি হলেও ন্যাসাল সেপ্টাম (nasal septum) বা নাসা ব্যবধায়ক-এর মাধ্যমে দুটি নাসারন্ধ্রের বিকাশ ঘটেছে।

কাজ: সম্মুখ নাসারন্ধ্র সবসময় উন্মুক্ত থাকে এবং এ পথেই বায়ু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

২. নাসাগহ্বর (Nasal Cavity) : সম্মুখ নাসারন্ধ্রের পরের অংশটি নাসাগহ্বর। নাসাগহ্বরের প্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস ক্ষরণকারী ও অলফ্যাক্টরি কোষ থাকে। এটি আগত প্রশ্বাস বায়ুকে কিছুটা সিক্ত করে।

কাজ: (i) সিলিয়াযুক্ত ও মিউকাস কোষগুলো ধুলাবালি এবং রোগজীবাণু আটকে দেয়। (ii) অলফ্যাক্টরি কোষ ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণে সাহায্য করে।

৩. পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র (Posterior Nostrils) : নাসা গহ্বরদ্বয় যে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় তাকে কোয়ানা (choana) বা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র বলে।

কাজ:এসব ছিদ্রপথে বাতাস নাসাগলবিলে প্রবেশ করে।

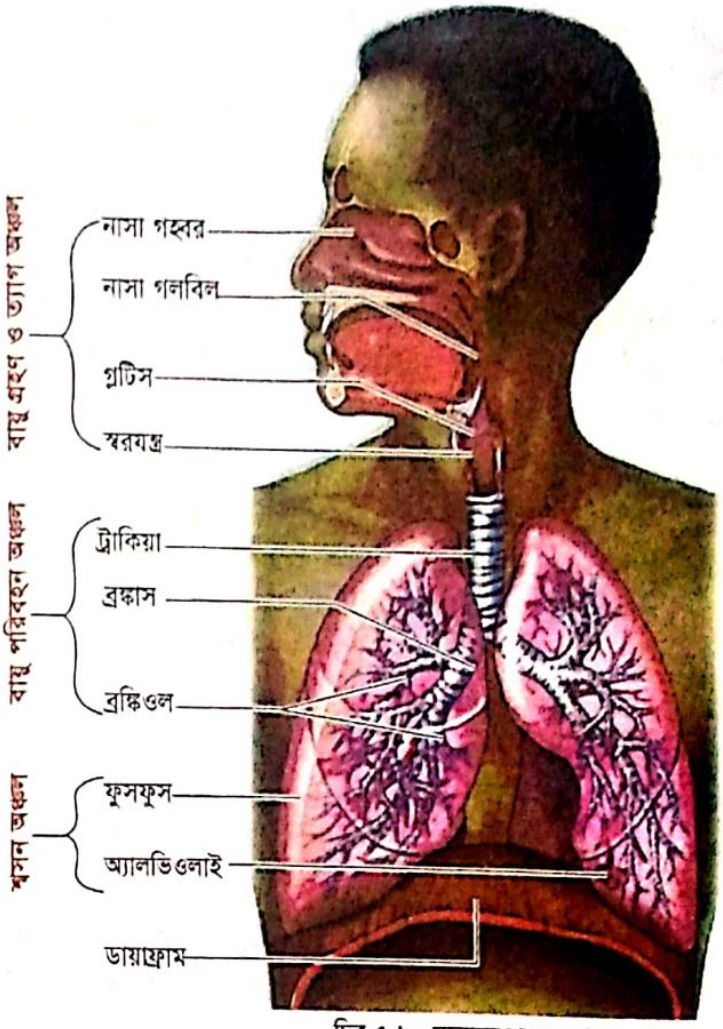

চিত্র ৫.১ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র

৪. নাসাগলবিল (Nasopharynx) : পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের পরে নাসাগলবিল অবস্থিত। এর পরেই মুখগলবিল (oropharynx), যা স্বরযন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫. স্বরযন্ত্র (Larynx) : এটি নাসাগলবিলের নিচের অংশের ঠিক সামনের দিকের অংশ এবং তিন ধরনের তরুণাস্থি টুকরায় (থাইরয়েড, ক্রিকয়েড এবং অ্যারিটিনয়েড) গঠিত। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড তরুণাস্থি সবচেয়ে বড় এবং এটি গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে (পুরুষে)। হাত দিলে এর অবস্থান বোঝা যায় এবং বাইরে থেকে দেখা যায়। একে Adam's Apple বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে থাকে একটি ছোট এপিগ্লটিস (epiglottis)। স্বরযন্ত্রে অনেক পেশি যুক্ত থাকে। এর অভ্যন্তরভাগে থাকে মিউকাস আবরণী ও ছয়টি স্বররজ্জু বা ভোকাল কর্ড (vocal cord)। পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণই স্বররজ্জুর টান (tension) বা শ্লথন (relaxation) নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ: (i) টানটান অবস্থায় বাতাসের সাহায্যে স্বররজ্জু কম্পিত হয়ে শব্দ সৃষ্টি করে। (ii) এপিগ্লটিস খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখটি বন্ধ করে দেয়। ফলে খাদ্য স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না, অন্য সময় এটি শ্বসনের উদ্দেশে উন্মুক্ত থাকে। (iii) স্বরযন্ত্রে স্বর সৃষ্টি হয়।

খ. বায়ু পরিবহন অঞ্চল

৬. শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া (Trachea) : স্বরযন্ত্রের পর থেকে পঞ্চম বক্ষদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত ১০–১২ সেমি. দীর্ঘ ও ২–২.৫ সেমি. ব্যাসবিশিষ্ট ফাঁপা নলাকার অংশকে ট্রাকিয়া বলে। এটি ১৫–২০টি তরুণাস্থি নির্মিত অর্ধবলয়ে (C-আকৃতির) গঠিত। তন্তুময় টিস্যু দিয়ে অর্ধবলয়গুলো আটকানো থাকে। ট্রাকিয়ার অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস আবরণী রয়েছে।

কাজ: (i) তরুণাস্থি নির্মিত হওয়ায় ট্রাকিয়া চুপসে যায় না বলে সহজে এর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে। (ii) এর অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়া অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রবেশ রোধ করে।

৭. ব্রঙ্কাস (Bronchus) : বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্ত দুটি (ডান ও বাম) শাখায় বিভক্ত হয়; এদের নাম **ব্রঙ্কাই** (bronchi –বহুবচন)। এগুলো ফুসফুসের **হাইলাম** (hilum) দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ডান ব্রঙ্কাসটি (একবচন) অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু প্রশস্ত এবং তিনভাগে ভাগ হয়ে ডান ফুসফুসের তিনটি খণ্ডে প্রবেশ করে। বাম ব্রঙ্কাসটি দুভাগে ভাগ হয়ে বাম ফুসফুসের দুটি খন্ডে প্রবেশ করে। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্রঙ্কাস পুনঃপুনঃ বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকায় **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) গঠন করে। ব্রঙ্কিওল দুধরনের– **প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল** ও **শ্বসন ব্রঙ্কিওল**। ব্রঙ্কাসে তরুণাস্থি থাকলেও ব্রঙ্কিওলগুলো তরুণাস্থিবিহীন।

কাজ: ব্রঙ্কাইয়ের মাধ্যমে ট্রাকিয়া থেকে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে।

গ. শ্বসন অঞ্চল

৮. ফুসফুস (Lungs) : ফুসফুস সংখ্যায় দুটি এবং হালকা গোলাপী রঙের স্পঞ্জের মতো নরম অঙ্গ। বাম ফুসফুসটি আকারে ছোট, ওজনে ৫৬৫ গ্রাম, **দুই লোব** বিশিষ্ট এবং ডান ফুসফুস আকারে বড়, ওজনে ৬২৫ গ্রাম, **তিন লোব** বিশিষ্ট। ফুসফুস দ্বিস্তরী **প্লিউরাল পর্দা** (pleural membrane) দিয়ে আবৃত থাকে। ভিতরের পর্দাকে **ভিসেরাল প্লিউরা** এবং বাইরের পর্দাকে **প্যারাইটাল প্লিউরা** বলে। দুই স্তরের মাঝে প্লিউরাল গহ্বরে **প্লিউরাল রস** নামক এক ধরনের রস থাকে। ব্রঙ্কাস যে অংশে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **হাইলাম** (hilum) বলে। হাইলামের মাধ্যমে **ধমনি ফুসফুসে প্রবেশ** এবং **শিরা** ও লসিকানালি বেরিয়ে আসে। ব্রঙ্কাস, ধমনি, শিরা, লসিকানালি, ঘন যোজক টিস্যুতে পরিবেষ্টিত হয়ে **পালমোনারি মূল** (pulmonary root) গঠন করে এবং এর সাহায্যেই ফুসফুস ঝুলে থাকে। ফুসফুসের প্রতিটি লোব কয়েকটি **সেগমেন্ট** (bronchopulmonary segments)-এ বিভক্ত। ডান ফুসফুসে ১০টি এবং বাম ফুসফুসে ৮টি সেগমেন্ট থাকে। প্রত্যেকটি সেগমেন্ট আবার অসংখ্য **লোবিউল** (lobule)-এ বিভক্ত। লোবিউলগুলো ফুসফুসের কার্যকরী একক। ফুসফুসে রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং পরিবেশের মধ্যে O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে।

ট্রাকিয়ার দ্বিবিভাজনে সৃষ্ট যে ব্রঙ্কাস ডান ও বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **প্রাইমারি ব্রঙ্কাস** বলে। প্রাইমারি ব্রঙ্কাস বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক লোবের জন্য একটি করে **সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস** বা **লোবার ব্রঙ্কাস** (lobar bronchus) গঠন করে (ডান ফুসফুসে ৩টি এবং বাম ফুসফুসে ২টি)। সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস থেকে টার্সিয়ারী ব্রঙ্কাস বা **সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস** সৃষ্টি হয়ে একটি করে পালমোনারি সেগমেন্টে প্রবেশ করে। সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস বার বার বিভক্ত হয়ে যে সূক্ষ্ম নালির সৃষ্টি হয় সেগুলোকে **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) বলে যা এক একটি লোবিউলে প্রবেশ করে। ব্রঙ্কিওল বিভক্ত হয়ে যেসব সূক্ষ্ম নালিকা সৃষ্টি করে তাদের **প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল** (terminal bronchiole) বলে। লোবিউলের ভিতরে প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল বিভক্ত হয়ে **শ্বসন ব্রঙ্কিওল** (respiratory bronchiole) গঠন করে এবং অ্যালভিওলার নালি, অ্যাট্রিয়াম ও অ্যালভিওলার থলি হয়ে পরিশেষে অ্যালভিওলাসে উন্মুক্ত হয়। প্রাইমারি ব্রঙ্কাস থেকে শুরু করে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত ফুসফুসের অভ্যন্তরীন গঠন চিত্র দেখতে একটি উল্টানো বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে সাধারণভাবে **শ্বসন বৃক্ষ**-ও বলে। শ্বসন ব্রঙ্কিওল থেকে অ্যালভিওলাই পর্যন্ত অংশকে একত্রে **শ্বসন একক** (respiratory unit) বলে। শুধু এই শ্বসন এককেই অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় ঘটে।

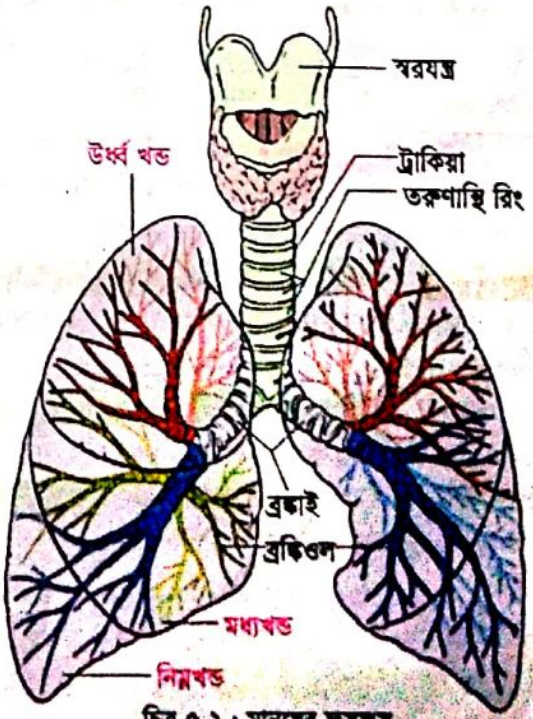

চিত্র ৫.২ : মানুষের ফুসফুস

চিত্র ৫.৩ : শ্বসন বৃক্ষ (চিত্রানুগ)

ফুসফুসের কাজ : (i) ফুসফুস মানুষের প্রধান **শ্বসন অঙ্গ**। ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শ্বসন গ্যাস O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে। (ii) দেহ থেকে শ্বসন বর্জ্য CO_2 নিষ্কাশন করে। (iii) দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, পানি সাম্যরক্ষা ও শব্দ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। (iv) ফুসফুসে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, লিপিড ও কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষিত হয়। (v) ইমিউনোগ্লোবিন ক্ষরণ করে। (vi) ফুসফুসীয় টিস্যু সেরোটোনিন ও হিস্টামিন সংরক্ষণ ও বিমুক্ত করে। (vii) ব্রাডিকিনিন ও প্রোস্টাগ্লান্ডিন সংশ্লেষ ও দেহ থেকে অপসারণ করে। (viii) অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ-এর মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে। (ix) অম্ল-ক্ষারের সাম্যাবস্থা রক্ষা করা।

শ্বসনতন্ত্রে বায়ু প্রবাহের গতিপথ হচ্ছে–
ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাস → ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলার নালি → অ্যাট্রিয়াম → অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাস

অ্যালভিওলাস-এর গঠন

অ্যালভিওলাস ফুসফুসের কার্যকরী একক। এগুলো আঙ্গুরের থোকার মতো গুচ্ছাবদ্ধ, অতি ক্ষুদ্রাকায়, বুদবুদ সদৃশ বায়ুথলি এবং গ্যাস বিনিময়ের তল (gas exchange surface) গঠন করে। ফুসফুসে অ্যালভিওলাসের সংখ্যা বয়সের সাথে সম্পর্কিত। নবজাতক শিশুর ফুসফুসে মাত্র ২০ মিলিয়ন অ্যালভিওলাই থাকে, ৮ বছরে এ সংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন; অন্যদিকে একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দুটি ফুসফুসে থাকে প্রায় ৪৮০ মিলিয়ন (২৭৪-৭৯০) অ্যালভিওলাই। অ্যালভিওলাইয়ের সংখ্যা ফুসফুসের আকারের উপর নির্ভরশীল। অ্যালভিওলাসের ব্যাস ০.২ মিলিমিটার এবং প্রাচীর মাত্র ০.২ মাইক্রোমিটার পুরু। এগুলোর বাইরের দিকে প্রচুর কৈশিকজালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। পালমোনারি ধমনি থেকে এগুলোর উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় মিলে **পালমোনারি শিরা** গঠন করে। প্রত্যেক অ্যালভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, চাপা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত হওয়ায় সহজেই গ্যাসের ব্যাপন ঘটতে পারে। অ্যালভিওলাস প্রাচীর **ফ্যাগোসাইটিক অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ** ধারণ করে। ম্যাক্রোফেজ অণুজীব এবং অন্যান্য বহিরাগত কণা ধ্বংস করে। তাছাড়া প্রাচীরে কোলাজেন ও স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। এ স্থিতিস্থাপক সূত্রের কারণে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের সময় অ্যালভিওলাস সহজেই প্রসারিত হতে পারে, আবার পূর্বাবস্থায় ফিরেও আসতে পারে।

অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে দু'ধরনের আবরণী কোষ থাকে। টাইপ-১ কোষ এবং টাইপ-২ কোষ। টাইপ-২ কোষের প্রাচীরের ভিতরের দিকে সারফ্যাকট্যান্ট (surfactant; dipalmitoyl lecithin) নামক ডিটারজেন্ট (detergent)-এর অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। সারফ্যাকট্যান্ট অ্যালভিওলাসে তরলের পৃষ্টটান (surface tension) হ্রাস করে অ্যালভিওলাসকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং গ্যাসীয় বিনিময়

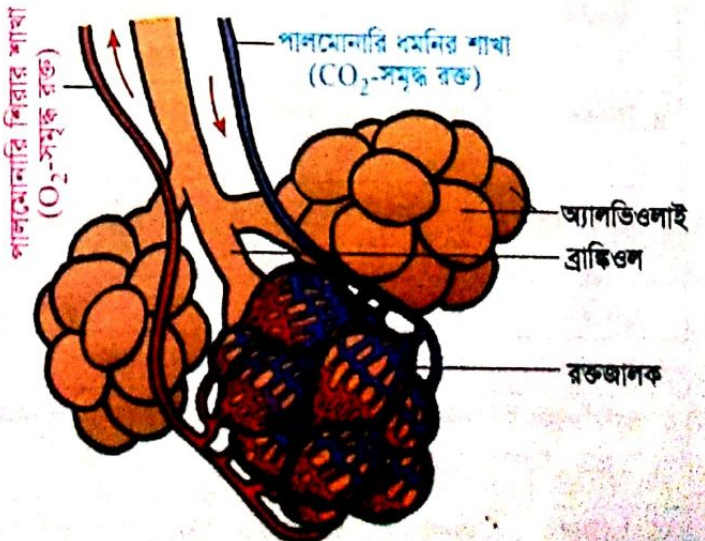

চিত্র ৫.৪ : ফুসফুসের অ্যালভিওলাই

সহজ করে। সারফ্যাকট্যান্টবিহীন অ্যালভিওলাস তথা ফুসফুস যথাযথ কাজ করতে পারে না। ২৩ সপ্তাহ বয়স্ক মানবভ্রূণে সর্বপ্রথম সারফ্যাকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয়। এ কারণে ২৪ সপ্তাহের আগে মানবভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না। অনেক দেশে তাই এ সময়কাল পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেয়া হয়।

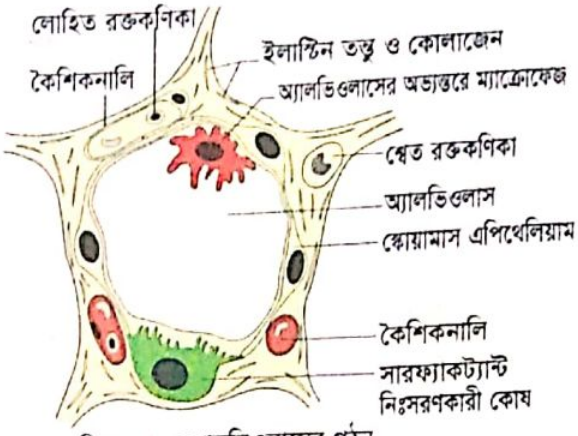

চিত্র ৫.৫ : অ্যালভিওলাসের গঠন

শ্বাস পেশি (Respiratory Muscles) : যে সব পেশি শ্বাসকার্যে সহায়তা করে, তাদেরকে শ্বাস পেশি বলে। এদের মধ্যে ডায়াফ্রাম পেশি এবং ইন্টারকোস্টাল পেশি উল্লেখযোগ্য। ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা বক্ষগহ্বর এবং উদর গহ্বরের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান একটি মাংসল পর্দা বিশেষ। এটি ঐচ্ছিক পেশি নির্মিত। এর পৃষ্ঠদেশ কিছুটা উত্তলাকার। এর মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে, যার মধ্য দিয়ে অন্ননালি, নিম্ন মহাশিরা এবং অ্যাওর্টা বক্ষগহ্বর থেকে উদর গহ্বরে প্রবেশ করে। শ্বাসগ্রহণের সময় এটি সঙ্কুচিত হয়ে নিচের দিকে নেমে এসে সমতল হয়ে যায়। শ্বাসত্যাগের সময় এটি ওপরের দিকে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। শ্বাসগ্রহণের সময় বক্ষপিঞ্জর প্রসারিত হয়। বক্ষপিঞ্জরের দুটো পর্শুকার (rib) মাঝে বিদ্যমান পেশিকে **ইন্টারকোস্টাল পেশি** বলে। শ্বাসগ্রহণের সময় ইন্টারকোস্টাল পেশি সঙ্কুচিত হয়, ফলে পর্শুকাগুলো বাইরের দিকে এবং উপরের দিকে উত্তোলিত হওয়ায় বক্ষপিঞ্জর প্রসারিত হয়ে বক্ষগহ্বরের আয়তন বাড়িয়ে দেয়। শ্বাসত্যাগের সময় ইন্টারকোস্টাল পেশি শিথিল বা প্রসারিত হয়, ফলে পর্শুকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়ে পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে, ফলে বক্ষপিঞ্জর সঙ্কুচিত হয়ে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়।

শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গসমূহের নাম এবং কাজ

অঙ্গ	প্রধান কাজ
১. নাসাগহ্বর	আগম্যমান (incoming) বায়ুকে ফিল্টার, গরম ও সিক্ত করে। মুখগলবিলে বায়ু প্রবেশের পথ হিসেবে কাজ করে।
২. মুখগলবিল	নাক এবং স্বরথলির মধ্যে বায়ু প্রবাহের জন্য, এবং মুখ থেকে অন্ননালিতে খাদ্যের চলনের জন্য করিডোর (passage way) হিসেবে কাজ করে।
৩. স্বরযন্ত্র	মুখগলবিল এবং শ্বসননালির অবশিষ্ট অংশে বায়ু চলনের জন্য করিডোর প্রদান করে। শব্দ তৈরি করে। ট্রাকিয়াকে বহিরাগত বস্তু থেকে রক্ষা করা।
৪. ট্রাকিয়া	বক্ষগহ্বর থেকে বায়ু যাতায়াতের করিডোর প্রদান করে। সিলিয়া দ্বারা বহিরাগত বস্তুকে আটকায় এবং বহিষ্কার করে।
৫. ডায়াফ্রাম	প্রশ্বাসের/শ্বাসগ্রহণের জন্য বক্ষগহ্বরকে বিস্তৃত করে এবং তারপর শ্বাসত্যাগ/নিঃশ্বাসের জন্য মূল আকৃতিতে ফেরত আসে।
৬. ব্রঙ্কাই	ফুসফুসে বায়ুর যাতায়াতের জন্য করিডোর প্রদান করে। বায়ু ফিল্টার করে।
৭. ব্রঙ্কিওল	অ্যালভিওলাসে বায়ুর যাতায়াতের জন্য করিডোর প্রদান করে।
৮. অ্যালভিওলাই	শ্বসনগ্যাস (O_2 এবং CO_2) বিনিময়ের স্থান। ফুসফুসের কার্যকরী একক (functional unit of lung)।
১০. ফুসফুস	প্রধান শ্বসন অঙ্গ।
১১. প্লিউরা	ফুসফুসের বহিঃপৃষ্ঠকে রক্ষা করে; প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে (compartmentalize) এবং পিচ্ছিল করে।

শ্বসনতন্ত্রের কাজ

১. **শ্বসনগ্যাসের বিনিময়** : শ্বসনের সময় পরিবেশের O_2 রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে CO_2 পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়।

২. **শক্তি উৎপাদন** : শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত O_2 কোষীয় শ্বসনে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

৩. **পানি সাম্য** : নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০০–৬০০ মিলিলিটার পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এতে দেহের পানি সাম্য বজায় রাখতে সুবিধা হয়।

৪. **তাপ নিয়ন্ত্রণ** : নিঃশ্বাসের সময় CO_2 এর সাথে দেহের কিছু তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপমাত্রা বজায় থাকে।

৫. **এসিড ও ক্ষারের সাম্যতা** : নিঃশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে CO_2 দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হওয়ায় pH নিয়ন্ত্রণে সহায়তা হয়।

৬. **শব্দ উৎপন্ন** : ল্যারিংক্সের মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন হয়।

৭. **হোমিওস্ট্যাসিস** : দেহাভ্যন্তরের স্থিতাবস্থা বা **হোমিওস্ট্যাটিস** (homeostasis; কোন জীব কর্তৃক অবিরত তার অন্তঃস্থ পরিবেশ রক্ষা করা বা জীবন ক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ স্থিতাবস্থা বজায় রাখা) এর ফলে পরিবর্তিত পরিবেশেও জীবকোষগুলো দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

৮. **উদ্বায়ী গ্যাস** : দেহ থেকে কিছু উদ্বায়ী গ্যাস, যেমন-ক্লোরোফর্ম, ইথার, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিষ্কাশন করে।

৯. **দূষিত পদার্থের প্রবেশ রোধ** : শ্বসনতন্ত্র বাতাসে বিদ্যমান জীবাণু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ প্রবেশ রোধ করে।

১০. **হরমোন ও আয়ন ঘনত্ব** : শ্বসনতন্ত্র দেহে হরমোন ও আয়নের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যবহারিক

ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (Section through Lung)

শনাক্তকরণ

১. অনুচ্ছেদের অভ্যন্তরভাগে বুদবুদ-এর মতো অসংখ্য **অ্যালভিওলাই** (alveoli) থাকে।

২. অ্যালভিওলাইগুলো **ট্র্যাবেকুলি** (trabeculae) নামক ব্যবধায়ক পর্দার মাধ্যমে পৃথক।

৩. অসংখ্য সূক্ষ্ম সিলিয়াযুক্ত বায়ু নালিকা বা **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) দেখা যায়।

৪. অ্যালভিওলাই ও ব্রঙ্কিওলের ফাঁকে ফাঁকে **রক্তনালি** অবস্থিত।

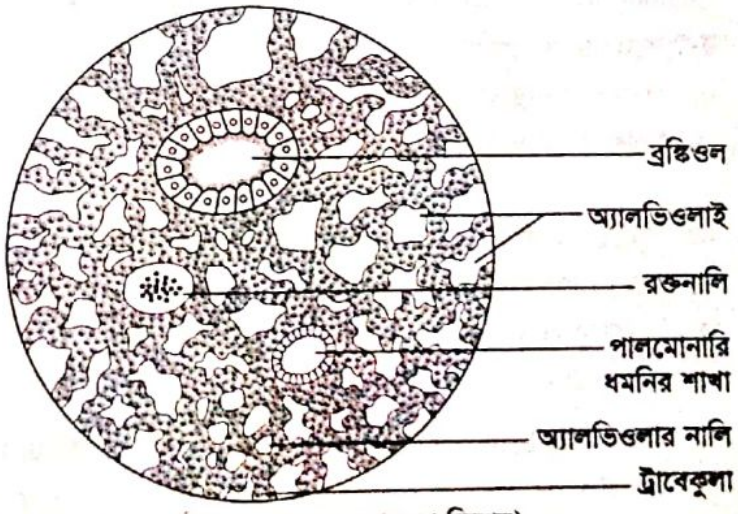

চিত্র ৫.৬ : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (অংশ বিশেষ)

শ্বসনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Respiration)

পরিবেশ থেকে গৃহীত O_2 দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্য (গ্লুকোজ) জারিত করে শক্তি উৎপাদন শেষে CO_2 পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়ার জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম শ্বসন। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া ও মানবদেহে নিরন্তর চলমান প্রক্রিয়া। নিচে বর্ণিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়।

১. **বহিঃশ্বসন (External Respiration)** : যে প্রক্রিয়ায় শ্বসন অঙ্গের রক্ত ও পরিবেশের মধ্যে শ্বসন গ্যাসের বিনিময় ঘটে তাকে বহিঃশ্বসন বলে। এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া যাতে দেহ পরিবেশ থেকে মুক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। এ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের কোন ভূমিকা নেই এবং কোন শক্তিও উৎপন্ন হয় না।

২. **অন্তঃশ্বসন (Internal Respiration) :** এটি জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া যা দেহকোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়। এখানে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। ফুসফুস কর্তৃক বায়ুমণ্ডল থেকে গৃহীত O_2 রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে দেহকোষে পৌছায় যেখানে গ্লুকোজ জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। উপজাত বস্তু হিসেবে নির্গত CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌছায়।

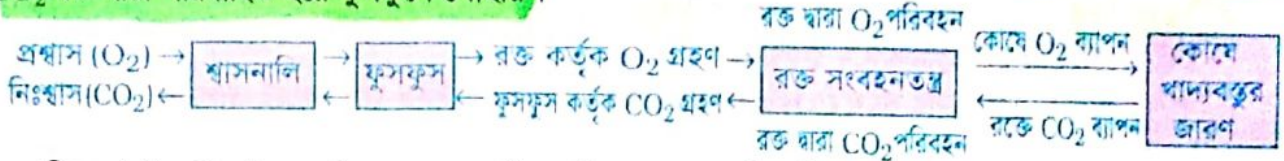

নিচে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম এবং গ্যাসীয় পরিবহন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (Ventilation Mechanism)

যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে শ্বাসক্রিয়া (breathing) বলে। প্রকৃতপক্ষে এটি বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়া। বক্ষগহ্বরের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ফুসফুসের আয়তন সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দুধরনের পেশির ক্রিয়ায় বক্ষগহ্বরের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে : (১) বক্ষ ও উদরগহ্বরের মাঝে অবস্থিত **মধ্যচ্ছদা** বা **ডায়াফ্রাম** (diaphragm) এবং (২) পর্শুকাসমূহের (ribs) ফাঁকে অবস্থিত **ইন্টারকোস্টাল পেশি** (intercostal muscle)। শ্বাসক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা: (ক) **প্রশ্বাস** বা শ্বাসগ্রহণ এবং (খ) **নিঃশ্বাস** বা শ্বাসত্যাগ।

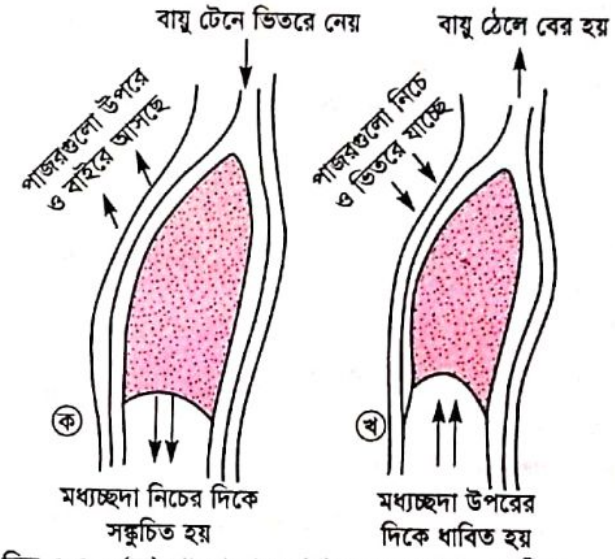

চিত্র ৫.৭ : (ক) শ্বাসগ্রহণ ও (খ) শ্বাসত্যাগ (সরল চিত্র)

ক. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration) : ডায়াফ্রাম সঙ্কুচিত হলে এর কেন্দ্রীয় টেনডন (tendon) নিম্নমুখে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষগহ্বরের অনুদৈর্ঘ্য ব্যাস বেড়ে যায়। একই সময় নিম্নভাগের **পর্শুকাগুলো** (ribs) কিছুটা উপরে উঠে আসায় বক্ষগহ্বরের পার্শ্বীয় এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসও বেড়ে যায়। **ইন্টারকোস্টাল** (intercostal) পেশির সঙ্কোচনের ফলে পর্শুকার দেহ (shaft) উত্তোলিত হয়। এতে স্টার্নাম উপরে উঠে সামনে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষের অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসসহ অনুপ্রস্থ ব্যাস বৃদ্ধি পায়।

এভাবে ডায়াফ্রাম ও পর্শুকা পেশির সঙ্কোচনের ফলে বক্ষীয়গহ্বরের সামগ্রিক আয়তন বেড়ে যায়। এ কারণে ফুসফুস প্রসারিত হয়ে এর ভিতরের আয়তনও বাড়িয়ে দেয়। প্রসারিত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ চাপ বাতাসের সাধারণ চাপ অপেক্ষা কম হওয়ায় নাসিকা পথের ভিতর দিয়ে আসা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে।

পরিবেশ থেকে O_2-সমৃদ্ধ বায়ু নাসারন্ধ্রপথে ট্রাকিয়া→ব্রঙ্কাস→ব্রঙ্কিওল→অ্যালভিওলাই তথা ফুসফুসে প্রবেশ।

খ. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ (Expiration) : এটি প্রশ্বাসের পর পরই সংঘটিত একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলোর প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য নিঃশ্বাস ঘটে।

নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শুকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়; উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়; ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; এবং প্লিউরার অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকা পথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

ফুসফুসে CO_2-সমৃদ্ধ বায়ু→অ্যালভিওলাই→ব্রঙ্কিওল→ব্রঙ্কাস→নাসাপথ→নাসারন্ধ্র পথে বাইরে নিষ্কাশন।

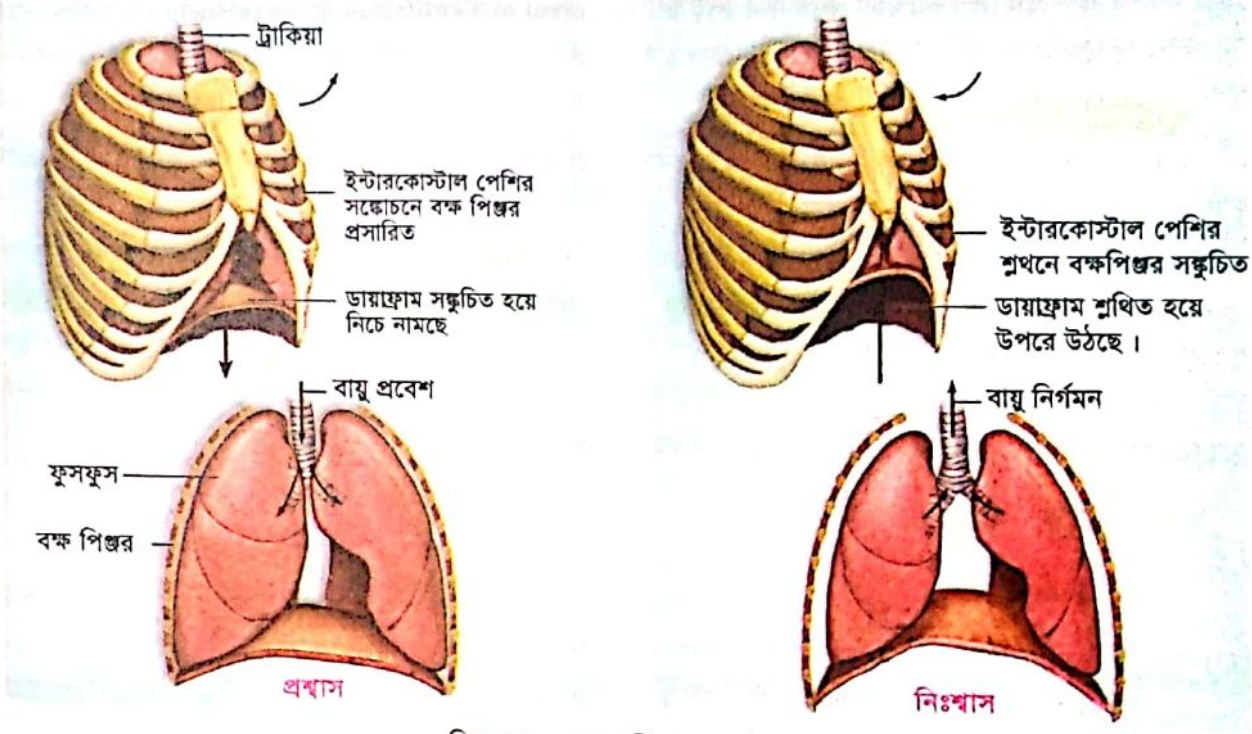

চিত্র ৫.৮ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম

শ্বসন একটি ছন্দোময় প্রক্রিয়া। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষে বিশ্রামকালে এ প্রক্রিয়া প্রতিমিনিটে ১৪–১৮ বার এবং নবজাত শিশুতে ৪০ বার সংঘটিত হয়। তবে ব্যায়াম বা অন্য কারণে শ্বসনের হার দ্রুত হয় বলে উদরীয় পেশিও তখন শ্বসন কাজে যোগ দেয়।

প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্বাস	নিঃশ্বাস
১. এ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের বায়ু ফুসফুসে গৃহীত হয়।	১. এ প্রক্রিয়ায় ফুসফুস মধ্যস্থ বায়ু পরিবেশে নির্গত হয়।
২. এটি একটি সক্রিয় পদ্ধতি।	২. এটি একটি নিষ্ক্রিয় পদ্ধতি।
৩. প্রশ্বাসের সময় বক্ষপিঞ্জরের পর্শুকাগুলোর ওপরের দিকে এবং বাইরের দিকে বিচলন ঘটে।	৩. নিঃশ্বাসের সময় বক্ষপিঞ্জরের পর্শুকাগুলোর নিচের দিকে এবং ভিতরের দিকে বিচলন ঘটে।
৪. প্রশ্বাসের সময় ডায়াফ্রাম নিচের দিকে নেমে এসে প্রায় সমতল হয়ে যায়।	৪. নিঃশ্বাসের সময় ডায়াফ্রাম উপরের দিকে বেঁকে গিয়ে ধনুকের মতো হয়ে যায়।
৫. প্রশ্বাসের সময় বক্ষগহ্বর এবং ফুসফুস দু'টির আয়তন বৃদ্ধি পায়।	৫. নিঃশ্বাসের সময় বক্ষগহ্বর এবং ফুসফুস দু'টির আয়তন হ্রাস পায়।
৬. প্রশ্বাসের সময় ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ বায়ুর চাপ বায়ুমণ্ডলের বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম হওয়ায় বায়ু নাসিকা ও ট্রাকিয়া পথে ফুসফুসে প্রবেশ করে।	৬. নিঃশ্বাসের সময় ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ বায়ুর চাপ বায়ুমণ্ডলের বায়ুর চাপ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় ফুসফুস মধ্যস্থ বায়ু ট্রাকিয়া ও নাসিকা পথে বাইরে বের হয়ে যায়।

প্রশ্বাস-নিশ্বাস কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ (Control of Ventilation Mechanism)

মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম দুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় : যথা:- ১. স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ ও ২. রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ।

১. স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ (Nervous Control)

মস্তিষ্কের কয়েকটি শ্বাসকেন্দ্র, শ্বসন সংশ্লিষ্ট প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং আরও কিছু স্নায়বিক উদ্দীপনা শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. শ্বাসকেন্দ্র (Respiratory Centre) : মস্তিষ্কে অবস্থিত চারটি কেন্দ্র থেকে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। পনস (pons)-এর পার্শ্বদেশে অবস্থিত একজোড়া স্নায়ুকেন্দ্র এবং মেডুলা অবলংগাটা (medulla oblongata)-র সম্মুখ ও পশ্চাতে অবস্থিত একজোড়া স্নায়ুকেন্দ্র প্রশ্বাস-নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। এদের শ্বাসকেন্দ্র বলে। পনসের পাশে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রদুটি যথাক্রমে নিউমোট্যাক্সিক ও অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্র (pneumotaxic and apneustic center) এবং মেডুলার পাশে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্র নামে পরিচিত।

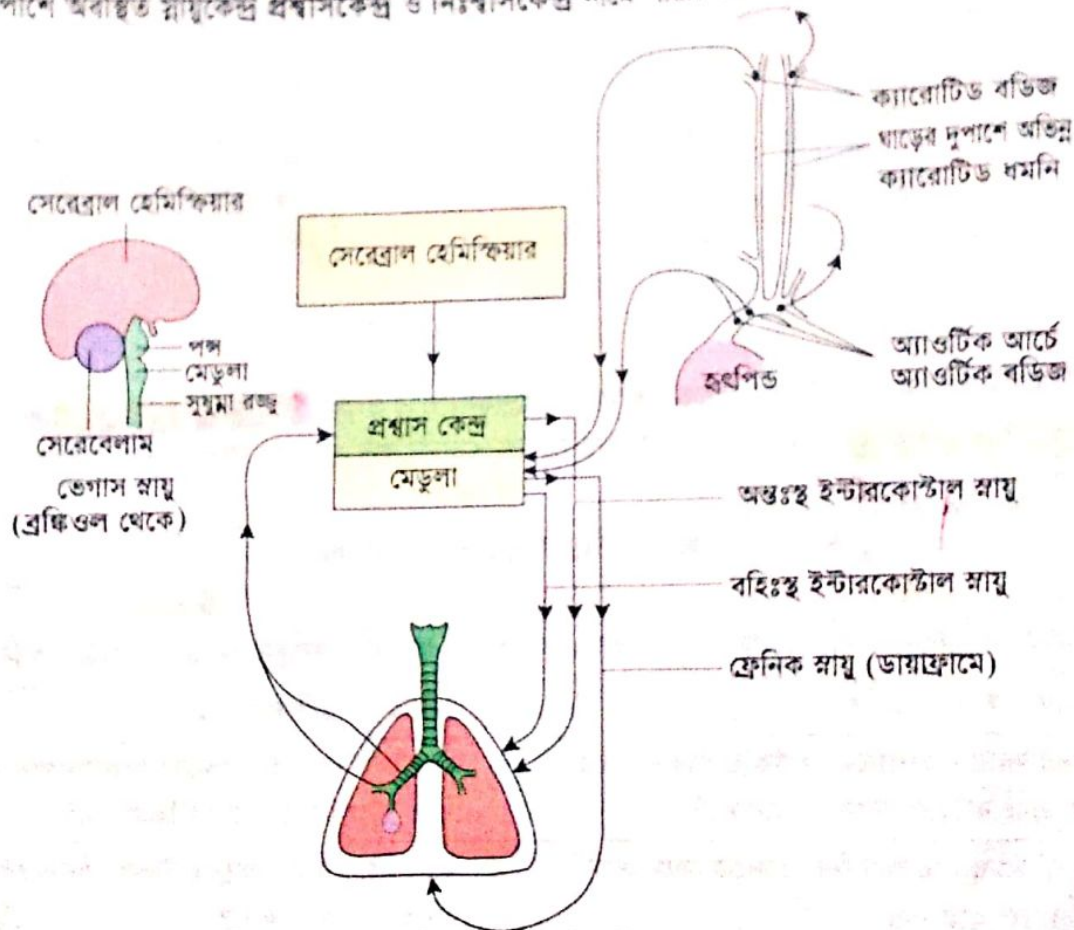

চিত্র ৫.৯ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ

উল্লিখিত স্নায়ুকেন্দ্রগুলো শ্বসন সংশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রতঙ্গের সঙ্গে স্নায়ুজালক দিয়ে যুক্ত। স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে প্রশ্বাসকেন্দ্র ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রের কার্যকারিতা পরস্পর বিপরীতমুখী অর্থাৎ যেকোনো একটি উদ্দীপিত হলে অন্যটি ছন্দোময় প্রক্রিয়ায় অবদমিত হয়ে পড়ে। রক্তে CO_2 এর উপস্থিতিতে অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র হয়ে প্রশ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছালে সেখান থেকে উদ্দীপনা স্নায়ুর মাধ্যমে ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশিতে পৌছায়। তৎক্ষনাৎ প্রশ্বাস শুরু হয়ে যায়। একই সময়ে স্নায়ুতাড়না প্রশ্বাসকেন্দ্র থেকে নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্রেও প্রেরিত হয়। নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্রের স্নায়ুতাড়না ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে ফুসফুসে বায়ুস্ফীতি উদ্দীপনা অ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌঁছালে তা প্রশমিত হয় ফলে প্রশ্বাসকেন্দ্রে স্নায়ুতাড়না বন্ধ হয়।

CamScanner

এতে প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এসময় নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র থেকে স্নায়ুতাড়না নিঃশ্বাস কেন্দ্রে পৌঁছালে নিঃশ্বাস শুরু হয়। নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র থেকে একই সাথে তাড়না প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছানোর ফলে একই সময়ে প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং নিঃশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় ফুসফুস সঙ্কোচনজনিত কোনো উদ্দীপনা অ্যানিউস্টিক কেন্দ্রে পৌঁছায় না বলে এর অবদমন ক্রিয়া অপসৃত হয়। ফলে অ্যানিউস্টিক কেন্দ্র পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ুতাড়না প্রশ্বাসকেন্দ্রে প্রেরণ করে। এতে পুনরায় প্রশ্বাস চালু হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমিক ঘটনার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

খ. শ্বসন অঙ্গে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action of Respiratory organ) : শ্বাসক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নিচে বর্ণিত প্রতিবর্তি ক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

- প্রশ্বাসে ফুসফুস বায়ুস্ফীত হলে ফুসফুসের সটান রিসেপ্টর (stretch receptor) উদ্দীপ্ত হয়। এ উদ্দীপনা ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়ুকেন্দ্রে প্রেরিত হলে কার্যক্রম প্রশমিত হয় ও প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। নিঃশ্বাসের সময় ফুসফুস সঙ্কুচিত থাকে বলে সটান রিসেপ্টর উদ্দীপিত হয় না, তাই ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে কোনো স্নায়ু তাড়না পরিবাহিত হয় না। এতে অ্যানিউস্টিক স্নায়ুকেন্দ্র কার্যকারিতা ফিরে পেয়ে প্রশ্বাস ঘটায়। ফুসফুসের এধরনের স্ফীতি ও সঙ্কোচনের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াকে **হেরিং-ব্রয়ার প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (Hering-Breur reflex) বলে। এভাবে শ্বাসক্রিয়ার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়।
- নাসিকাগহ্বরের প্রাচীরে মিউকাস পর্দায় উদ্দীপনাজনিত স্নায়ুতাড়না **অলফ্যাক্টরি স্নায়ু** (olfactory nerve)-র মাধ্যমে হাঁচি (sneezing) প্রতিবর্তি ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায় এবং শ্বাসক্রিয়ায় পরিবর্তন আনে।
- ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালিতে বহিরাগত কোনো পদার্থ প্রবেশ করলে এর মিউকাস পর্দা উদ্দীপিত হয়ে ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে কাশি (caughing) প্রতিবর্তি ক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায় এবং শ্বাসক্রিয়ায় পরিবর্তন আনে।
- খাদ্য গলাধঃকরণ বাধাগ্রস্থ হলে গলবিল গাত্রের উদ্দীপনাজনিত স্নায়ুতাড়না **গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুর** (glossopharyngeal nerve) মাধ্যমে **গলবিলীয় বা গ্যাগ প্রতিবর্তি** (pharyngeal or gag reflex) ক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।
- অনেক সময় দেহের ত্বক, ভিসেরা, পেশি, অস্থিসন্ধি ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত স্নায়ুতাড়না প্রতিবর্তি ক্রিয়ার মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

গ. অন্যান্য স্নায়বিক উদ্দীপনা (Other Nervous Stimulations) : সেরেব্রাল কর্টেক্স, মধ্যমস্তিষ্ক, হাইপোথ্যালামাস প্রভৃতি স্থানে গৃহীত স্নায়ুতাড়নাও অনেকক্ষেত্রে শ্বাসক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সেরেব্রাল কর্টেক্সের যেসব স্থান কথা বলা, ঘ্রাণ গ্রহণ, খাদ্য চর্বণ ও গলাধঃকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটানোর সূচনা ঘটায়। যেমন-কথা বলার সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পরই দ্রুত প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটে। হাইপোথ্যালামাস আবেগজনিত স্নায়ুতাড়না দিয়ে শ্বাসক্রিয়া প্রভাবিত করে। দেহের যেকোনো স্থান থেকে উদ্ভূত যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ুতাড়না শ্বাসক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে। কিন্তু অধিক যন্ত্রণাদায়ক স্নায়ুতাড়না শ্বাসক্রিয়াকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়।

২. রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ (Chemical Control)

রক্তে CO_2-এর মাত্রা বৃদ্ধি, O_2-এর অভাব, H^+ আয়নের আধিক্য ইত্যাদি কারণে ক্যারোটিড ও অ্যাওর্টিক রক্তনালির কেমোরিসেপ্টর কোষগুলো উদ্দীপিত হয়ে স্নায়ু উদ্দীপনার মাধ্যমে শ্বাসকেন্দ্রগুলোকে উদ্দীপিত করে থাকে। অপরদিকে এসব উদ্দীপনা রক্ত হতে শ্বাসকেন্দ্র সরাসরি গ্রহণ করে শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গ্যাসীয় (O_2 ও CO_2) পরিবহন (Transport of Gases)

ফুসফুস গহ্বরের ভিতরে অ্যালভিওলাই-এর বাতাস এবং এগুলোর প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিকনালির রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে।

CamScanner

ক. অক্সিজেন পরিবহন

প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাস ফুসফুসে পৌছালে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে O_2-এর চাপ থাকে ১০৪ mmHg। অন্যদিকে, ফুসফুসের কৈশিকজালিকায় দেহ থেকে আগত রক্তে O_2-চাপ থাকে ৪০ mmHg। সুতরাং ফুসফুস থেকে O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসীয় ঝিল্লি ভেদ করে রক্তে প্রবেশ করে। এই ব্যাপন যতক্ষণ না রক্তে O_2-এর চাপ ১০০mmHg উপনীত হয় ততক্ষণ অব্যাহত থাকে। রক্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়: **ভৌত দ্রবণরূপে** ও **রাসায়নিক যৌগরূপে**।

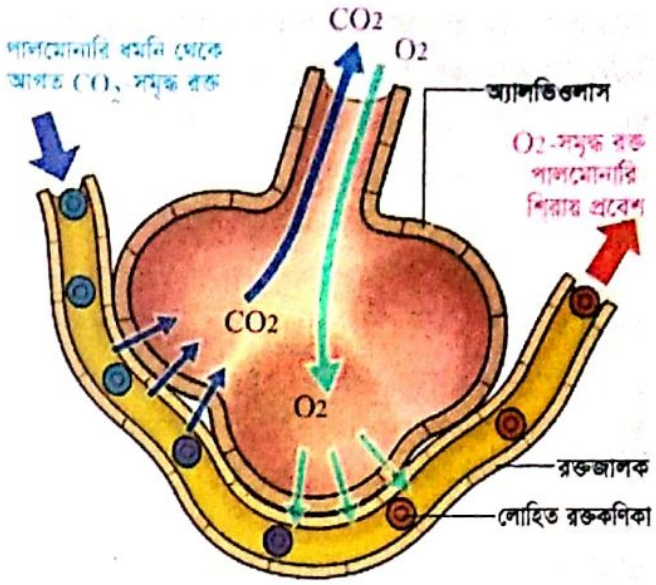

চিত্র ৫.১০ : অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময়

i. ভৌত দ্রবণরূপে (In Physical Solution) : প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে ০.২ থেকে ০.৩ মি.লি. অক্সিজেন রক্তরসের পানিতে ভৌত দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয়। দ্রবীভূত অংশই রক্তে ১০০ mmHg চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী। তবে অংশের পরিমাণ খুব সামান্য বলে তা টিস্যুকোষে অক্সিজেন সরবরাহ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে না। তবে অক্সিজেন ও হিমোগ্লোবিনের সংযোজন কাজে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ii. রাসায়নিক যৌগরূপে (As Chemical Compound) : O_2 রক্তে প্রবেশের পর লোহিত কণিকায় অবস্থিত **হিমোগ্লোবিন**-এর সাথে যুক্ত হয়ে **অক্সি-হিমোগ্লোবিন** গঠন করে। এটি একধরনের শিথিল রাসায়নিক যৌগ, যা অক্সিজেনের চাপ কমে গেলে পুনরায় বিযুক্ত হয়। এ সংযোজন রক্তে অক্সিজেনের দ্রবীভূত অংশের চাপের উপর নির্ভরশীল। এ চাপ যত বাড়ে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে তত বেশি সংযুক্ত হয়।

$$Hb_4 + 4O_2 \rightleftharpoons 4HbO_2$$ [Hb = হিমোগ্লোবিন]

খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন

শর্করা জারণের সময় কোষে CO_2 সৃষ্টি হয়। এই CO_2 দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোষ থেকে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বায়ুতে মুক্ত হয়। নিচে বর্ণিত তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়।

i. ভৌত দ্রবণরূপে : কিছু পরিমাণ (৫%) CO_2 রক্তরসের পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড গঠন করে।

$$H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3$$ (কার্বনিক এসিড)

এ বিক্রিয়ায় **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** এনজাইম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

প্রতি হাজার CO_2 অণুর মধ্যে মাত্র এক অণু H_2CO_3 রূপে দ্রবণে উপস্থিত থাকে। সুতরাং CO_2-এর খুব সামান্য অংশই H_2CO_3 রূপে পরিবাহিত হয়।

ii. কার্বামিনো যৌগরূপে : টিস্যুকোষ থেকে রক্তের প্লাজমায় আগত CO_2 -এর কিছু অংশ লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। লোহিত কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার **গ্লোবিন** (প্রোটিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের-(NH_2) সাথে CO_2 যুক্ত হয়ে **কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে।

$$CO_2 + HbNH_2 \rightarrow HbN\begin{matrix} H \\ COOH \end{matrix} = HbNHCOOH$$ (কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন)

CO_2-এর একাংশ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে **কার্বামিনোপ্রোটিন** গঠন করে।

$PrNH_2 + CO_2 \rightarrow PrNHCOOH$ (কার্বামিনোপ্রোটিন)

এ রাসায়নিক ক্রিয়া এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

মোট CO_2-এর শতকরা ২৭ ভাগ কার্বামিনো যৌগরূপে পরিবাহিত হয়। প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে এর পরিমাণ ৩ মি.লি. যার ২ মি.লি কার্বামিনোহিমোগ্লোবিনরূপে এবং ১ মি.লি কার্বামিনোপ্রোটিনরূপে পরিবাহিত হয়।

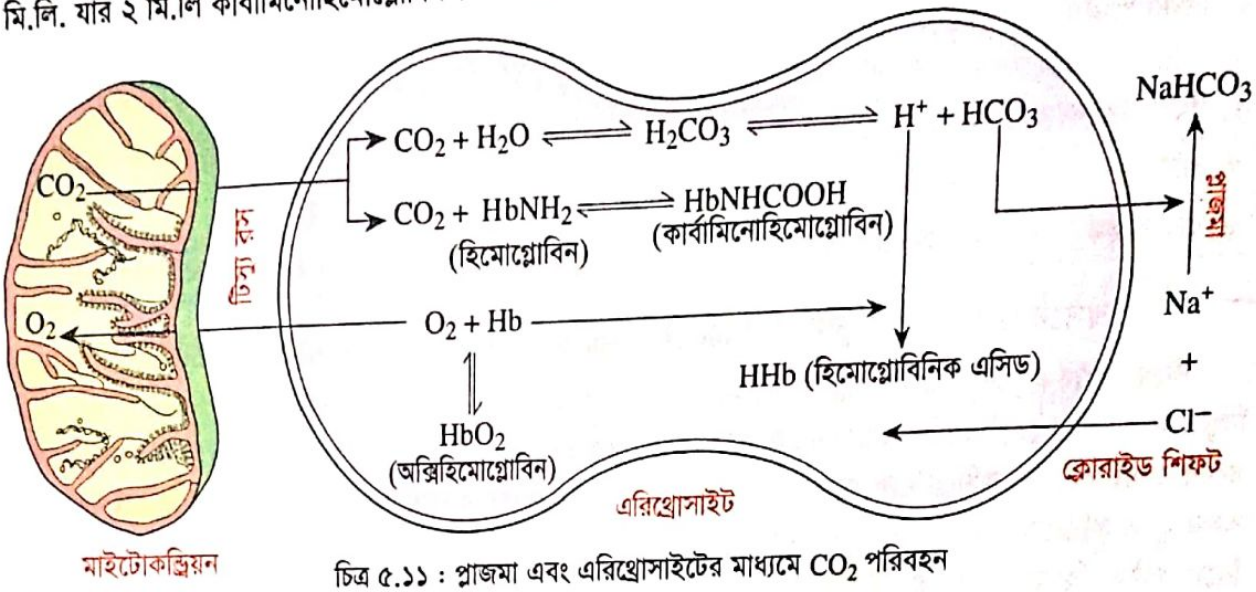

চিত্র ৫.১১ : প্লাজমা এবং এরিথ্রোসাইটের মাধ্যমে CO_2 পরিবহন

iii. **বাইকার্বোনেট যৌগরূপে** : CO_2-এর বেশির ভাগই (৬৫%) রক্তে বাইকার্বোনেটরূপে পরিবাহিত হয়। এটি– (১) $NaHCO_3$– রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং (২) $KHCO_3$ –রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

টিস্যুরস থেকে CO_2 প্রথমে প্লাজমায় ও পরে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে লোহিত কণিকার মধ্যে CO_2 পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। রক্তরসে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ অনুপস্থিত থাকায় রক্তরসে খুব কম মাত্রায় কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3} \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

লোহিত কণিকায় উৎপন্ন H_2CO_3 বিশ্লিষ্ট হয়ে H^+ ও HCO_3^- আয়নে পরিণত হয়। লোহিত কণিকায় বেশি মাত্রায় HCO_3– সঞ্চিত হওয়ায় এর ঘনত্ব প্লাজমার তুলনায় বেশি হয়।

আয়ন লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় পরিব্যাপ্ত (diffuse) হয় এবং প্লাজমার Na^+ আয়নের সাথে মিলে $NaHCO_3$ উৎপন্ন করে। লোহিত কণিকার মধ্যে K^+ আয়নের সাথে HCO_3– বিক্রিয়া করে $KHCO_3$ এ পরিণত হয়।

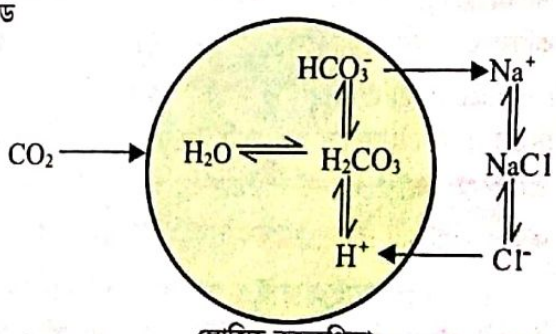

চিত্র ৫.১২ : ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া

লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় HCO_3– আয়ন আগমনের সাথে সমতা রেখে প্লাজমা থেকে Cl^- লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে এবং লোহিত কণিকায় K^+ আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে KCl গঠন করে। লোহিত কণিকা থেকে HCO_3 আয়ন বেরিয়ে আসায় ঋণাত্মক আয়নের যে ঘাটতি হয় প্লাজমার ক্লোরাইড (Cl^-) আয়ন লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সে ঘাটতি পূরণ করে। একে **ক্লোরাইড শিফট** (chloride shift) বলে। এর প্রথম বর্ণনাকারী জার্মান শারীরবৃত্তবিদ **হার্টগ জ্যাকব হ্যামবার্গার** (Hartog Jacob Hamburger)-**এর নাম অনুসারে ক্লোরাইড শিফটকে হ্যামবার্গার শিফটও বলা হয়।**

100%

বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের পার্থক্য		
আলোচ্য বিষয়	বহিঃশ্বসন	অন্তঃশ্বসন
১. প্রকৃতি	একটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া।	একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
২. ক্রিয়াস্থল	এটি ফুসফুসের অভ্যন্তরে সম্পন্ন হয়।	এটি সকল কোষ অভ্যন্তরে সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াতে এবং রক্তে সম্পন্ন হয়।
৩. ক্রিয়া পদ্ধতি	পরিবেশ থেকে O_2 ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং CO_2 ফুসফুস থেকে বাইরের পরিবেশে মুক্ত হয়।	কোষ মধ্যস্থ খাদ্যসার O_2 দ্বারা জারিত হয়ে শক্তি, পানি ও CO_2 তৈরি করে।
৪. প্রধান উপ-পর্যায়	শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ।	গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র ও গ্যাস পরিবহন।
৫. শক্তি	শক্তি উৎপন্ন হয় না।	শক্তি উৎপন্ন হয়।
৬. এনজাইম	এনজাইমের ভূমিকা নেই।	এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শ্বসনে শ্বাসরঞ্জকের ভূমিকা (Role of Respiratory Pigments during Respiration)

হিমোগ্লোবিন হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের লোহিত কণিকায় এবং অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্লাজমায় (রক্তরসে) বিস্তৃত লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী অক্সিজেনবাহী শ্বাসরঞ্জক। লোহিত রক্তকণিকার প্রধান প্রোটিন হচ্ছে **হিমোগ্লোবিন**। এর বর্ণের জন্যই লোহিত কণিকা লাল দেখায় এবং লোহিত কণিকার সংখ্যাধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস অক্সিজেন পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে, কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডও বহন করে। চারটি একক নিয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন একটি গোল অণু। এর প্রতিটি একক পলিপেপটাইড জাতীয় প্রোটিন **গ্লোবিন** (globin) এবং লৌহগঠিত **হিম** (heme) নিয়ে গঠিত। রক্তে হিম ও গ্লোবিন ১ঃ২৫ অনুপাতে উপস্থিত থাকে। হিমের ৩৩.৩৩% লৌহ (Fe)। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র ৪-৫ গ্রাম লৌহ থাকে।

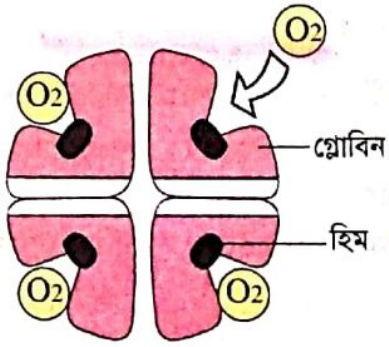

চিত্র ৫.১৩ : হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সংবন্ধন

i. **অক্সিজেন পরিবহন** : শ্বসনের সময় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রবিষ্ট সমস্ত অক্সিজেনই মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এর এক বড় অংশ লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (oxyhaemoglobin) নামে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ গঠন রক্তরসে (প্লাজমায়) অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। রক্তরসে যত বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হবে তার সাথে সংগতি রেখে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ উৎপন্ন হবে। অন্যদিকে, অক্সিজেনের পরিমাণ যে হারে কমে যাবে যৌগ সে হারে ভেঙে যাবে এবং অক্সিজেন মুক্ত হয়ে রক্তরসে প্রবেশ করবে। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন চারটি হিম অংশ থাকায় এর চারটি ফেরাস অণু চার অণু অক্সিজেন যুক্ত করতে পারে।

ii. **কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন** : CO_2 হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে **কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন** নামক অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে।

দেহে রক্ত পরিবহনের সময় বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তরস থেকে স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত টিস্যুরসে চলে যায়। ফলে রক্তরসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। হিমোগ্লোবিন তখন তার সাথে যুক্ত অক্সিজেন ছাড়তে শুরু করে। এভাবে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসে ও পরে টিস্যুরসে চলে যায়।

CamScanner

শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার
(Problems, Symptoms and Remedy of Respiratory Tract Disease)

সচল মানবদেহের জন্য সুস্থ অঙ্গতন্ত্র প্রয়োজন। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে শ্বসনতন্ত্রের **শ্বসননালি** অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এটি প্রায়ই ভাইরাসে, মাঝে-মধ্যে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সচল দেহকে প্রায় আধা-অচল করে দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শ্বসননালির সংক্রমণকে নিচে বর্ণিত দুভাগে ভাগ করে থাকেন।

উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণ : এতে নাক, কান, সাইনাস ও গলা আক্রান্ত হয়। **সাধারণ ঠাণ্ডা, টনসিলাইটিস** (টনসিলের সংক্রমণ), **সাইনুসাইটিস** (সাইনাসের সংক্রমণ), **ল্যারিনজাইটিস** (স্বরযন্ত্রের সংক্রমণ), **ওটাইটিস মিডিয়া** (কানের সংক্রমণ) ইত্যাদি **উর্ধ্ব শ্বসননালির সংক্রমণ**। এ ধরনের সংক্রমণে কাশি, মাথা ব্যথা, নাক দিয়ে পানি ঝরা, গলাব্যধা, হাঁচি ও পেশির ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণ : এতে শ্বাসনালি ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়। **ফ্লু** (শ্বাসনালির সংক্রমণ), **ব্রঙ্কাইটিস** (শ্বাসনালির সংক্রমণ), **নিউমোনিয়া** (ফুসফুসের সংক্রমণ), **যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিস** (ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ) ইত্যাদি **নিম্ন শ্বসননালির সংক্রমণ**। এ ধরনের সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ হলো কাশি।

উর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণের উদাহরণ হিসেবে সিলেবাসভুক্ত **সাইনুসাইটিস** ও **ওটাইটিস মিডিয়া** সৃষ্ট সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. সাইনুসাইটিস (Sinusitis)

মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত বায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরকে **সাইনাস** বা **প্যারান্যাসাল সাইনাস** (paranasal sinus) বলে। এগুলো হলো–

১. **ম্যাক্সিলারি সাইনাস (Maxillary Sinus)** : ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে গালে অবস্থিত। এর প্রদাহের কারণে গালে, দাঁতে ও মাথায় ব্যথা হয়।

২. **ফ্রন্টাল সাইনাস (Frontal Sinus)** : চোখের উপরে অবস্থিত। এর প্রদাহের কারণে চোখের উপরে ও মাথায় ব্যথা হয়।

৩. **এথময়েড সাইনাস (Ethmoid Sinus)** : দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত। এর প্রদাহের কারণে দু'চোখের মাঝখানে বা পিছনে এবং মাথায় ব্যথা হয়।

৪. **স্ফেনয়েড সাইনাস (Sphenoid Sinus)** : এথময়েড সাইনাসের পিছনে অবস্থিত। এর কারণে চোখের পিছনে ও মাথার চূড়ায় ব্যথা হয়।

চিত্র ৫.১৪ : সাইনুসাইটিস

সাইনাস সাধারণত বায়ুপূর্ণ মিউকাস পর্দায় আবৃত এবং ক্ষুদ্র নালির মাধ্যমে নাসাগহ্বর তথা শ্বাসনালির সাথে যুক্ত থাকে। এসব সাইনাস যদি বাতাসের বদলে তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে এবং এই তরল যদি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকে সংক্রমিত হয় তখন সাইনাসের মিউকাস পর্দায় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। **ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সংক্রমণে বা এলার্জিজনিত কারণে সাইনাসের মিউকাস পর্দায় যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাকেই সাইনুসাইটিস বলে।** সাইনুসাইটিসের কারণে মাথা ব্যথা, মুখমন্ডলে ব্যথা, নাক দিয়ে ঘন হলদে বা সবুজাভ তরল ঝরে পড়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সাইনুসাইটিস দুরকম :

১. অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস (Acute Sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ৪ – ৮ সপ্তাহ।

২. ক্রনিক সাইনুসাইটিস (Chronic Sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ২ মাসের বেশি সময়।

রোগের কারণ

১. সাইনাসগুলো বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস (Human Respiratory Syncytial Virus, Parainflueza Virus, Metapneumo Virus), ব্যাকটেরিয়া (*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*) এবং কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাকে আক্রান্ত হলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।

২. ঠাণ্ডাজনিত কারণে; অ্যালার্জিজনিত কারণে; ব্যবধায়ক পর্দার অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে; নাকে পলিপ (polyp) সৃষ্টি হলে; নাসাগহ্বরের মিউকোসা স্ফীতির ফলে নাসাপথ সরু হয়ে ক্রনিক সাইনুসাইটিস হতে পারে।

৩. দাঁতের ইনফেকশন থেকে বা দাঁত তুলতে গিয়েও সাইনাসে সংক্রমণ হতে পারে।

৪. যারা হাঁপানির সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিস দেখা যায়।

৫. সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট, তেলাপোকা ইত্যাদি যেসব **অ্যালার্জেন** (allergen; অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বস্তু) ধারণ করে তার প্রভাবে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে।

৬. **ইউস্টেশিয়ান নালির** (eustachian tube) সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে এবং সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।

৭. নাকের হাড় বাঁকা থাকলে অথবা মুখগহ্বরের **টনসিল** বড় হলে এ রোগ হতে পারে।

৮. সিস্টিক ফাইব্রোসিস (cystic fibrosis) এর কারণে এ রোগ হয়।

৯. অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ ও ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের কারণেও এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

১. নাক থেকে হলদে বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের হয়, এতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে।
২. দীর্ঘ ও বিরক্তিকর তীব্র মাথা ব্যথা লেগেই থাকে যা সাইনাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে পারে।
৩. মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাঁটলে বা মাথা নিচু করলে ব্যথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়।
৪. জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কোন কিছু ভালো লাগে না বরং অল্পতেই ক্লান্ত লাগে।
৫. নাক বন্ধ থাকে, নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে বাজে গন্ধ বের হয়।
৬. মুখমন্ডল অনুভূতিহীন মনে হয়।
৭. মাথাব্যথার সাথে দাঁতব্যথাও হতে পারে।
৮. কাশি হয়, রাতে কাশির তীব্রতা বাড়ে, গলা ভেঙ্গে যায়।

জটিলতা

সাইনুসাইটিস সংক্রান্ত জটিলতা কেবল নাসিকাগহ্বর ঘিরেই অবস্থান করে না, বরং সাইনাসগুলোর অবস্থান চোখ ও মস্তিষ্কের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের সংলগ্ন হওয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ শুধু সাইনাসেই সীমাবদ্ধ না থেকে রক্তবাহিত হয়ে চোখ ও মস্তিষ্কে পৌছালে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে সংক্রমণের ফলে মাথাব্যথা, দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। চোখে সংক্রমণের ফলে **পেরিঅরবিটাল ও অরবিটাল সেলুলাইটিসসহ** আরও অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার

স্বেচ্ছাসতর্কতা : সাইনাসে জমাট বেঁধে থাকা তরলকে বিগলিত করে সাইনাসকে চাপমুক্ত ও স্বাভাবিক রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

CamScanner

১. গরম পানিতে ভিজিয়ে, চিপড়ে একখন্ড কাপড় প্রতিদিন বারবার মুখমন্ডলে চেপে ধরা।
২. মিউকাস তরল করতে প্রচুর পানি পান করা।
৩. প্রতিদিন ২-৪ বার নাক দিয়ে বাষ্প টেনে নেয়া।
৪. দিনে কয়েকবার ন্যাসাল স্যালাইন স্প্রে করা।
৫. আর্দ্রতা প্রতিরোধক ব্যবহার করা।
৬. যন্ত্রের সাহায্যে নাকের ভিতর সবেগে পানি প্রবাহিত করে সাইনাস পরিষ্কার রাখা।
৭. বন্ধ নাক খোলার জন্য ন্যাসাল স্প্রে ব্যবহারে সতর্ক থাকা [প্রথম দিকে ন্যাসাল স্প্রে ভালো কাজ করলেও ৩-৫ দিন একনাগাড়ে ব্যবহার করলে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে]।
৮. নাক বন্ধ অবস্থায় উড়োজাহাজে না চড়াই ভালো।
৯. মাথা নিচু করে শরীর বাঁকানো অনুচিত।

ওষুধ প্রয়োগ : অ্যাকিউট সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় ওষুধের দরকার হয় না। তবে প্রয়োজনে দু'সপ্তাহের চিকিৎসা চলতে পারে। ক্রনিক সাইনুসাইটিসের চিকিৎসা চলে ৩-৪ সপ্তাহ। ছত্রাকজনিত সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় বিশেষ ধরনের ওষুধ ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিবায়োটিকসহ সমস্ত ওষুধ ব্যবহারে চিকিৎসকের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী হতে হবে।

কোনো শিশু যদি নাক দিয়ে তরল-নির্গমনসহ ২-৩ সপ্তাহ ধরে কাশিতে, ১০২.২° এ জ্বরে, মাথাব্যথা ও প্রচন্ড চোখফোলা অসুখে ভোগে তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ শুরু করতে হবে।

২. ওটাইটিস মিডিয়া (Otitis Media) — মধ্যকর্ণের সংক্রমণ

কানের ভিতরে বা বাইরে যে কোন অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটাইটিস** (otitis) বলে। কানের মধ্যকর্ণে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলা হয় **ওটাইটিস মিডিয়া** (otitis media / middle ear infection)। গলবিলের সাথে মধ্যকর্ণের সংযোগ স্থাপনকারী **ইউস্টেশিয়ান নালি** (eustachian tube) টি অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে, শুধু ঢোকগেলার সময় খোলা থাকে। কোনো কারণে কোনো জীবাণু এ নালি দিয়ে এসে মধ্যকর্ণে প্রদাহ সৃষ্টি করলে তাকে **ওটাইটিস মিডিয়া** বলে। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

শিশুদের ওটাইটিস মিডিয়া দুধরনের হয়ে থাকে। যথা– **স্বল্পস্থায়ী** ও **দীর্ঘস্থায়ী**।

১. স্বল্পস্থায়ী বা অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া : এক্ষেত্রে ইউস্টেশিয়ান নালির প্রতিবন্ধকতার কারণে ঊর্ধ্ব শ্বাসনালি আক্রান্ত হয় এবং মধ্যকর্ণ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ নিরাময় হয়।

২. দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া : এক্ষেত্রে দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রোগ নিরাময় হয় না। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ রোগে কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে পুঁজ বা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে।

রোগের কারণ

১. প্রধানত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়। Respiratory Syncytial Virus (RSV), Influenza Virus, Rhinovirus এবং *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis* ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে।
২. মধ্যকর্ণের সাথে নাকের সংযোগস্থল (eustachian tube) ফুলে বন্ধ হয়ে গেলে।
৩. কোন কারণে **অ্যাডিনয়েড** (adenoid; নাসাগলবিলে অবস্থিত একধরনের লসিকাগ্রন্থি) ফুলে গেলে।
৪. মাতৃদুগ্ধ পান না করালে বা কম করালে।
৫. শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে ঠান্ডা লাগলে এবং কানের সংক্রমণ হলে।

ওটাইটিস মিডিয়া কাদের বেশি হয়

যাদের ওটাইটিস মিডিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে তারা হলো–

১. চার মাস থেকে চার বছর বয়সি শিশুদের।
২. ডে কেয়ার সেন্টারগুলোর মতো জায়গাতে যেখানে একসাথে অনেক শিশু বেড়ে উঠে সেসব শিশুদের।
৩. যেসব শিশুদের নিচু অবস্থানে শুইয়ে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয়।
৪. যেসব শিশুরা ধুমপানযুক্ত ও বায়ু দূষণপূর্ণ এলাকায় বাস করে।
৫. পরিবারের অন্য কারো কানে সংক্রমণ হলে শিশুদেরও কানের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

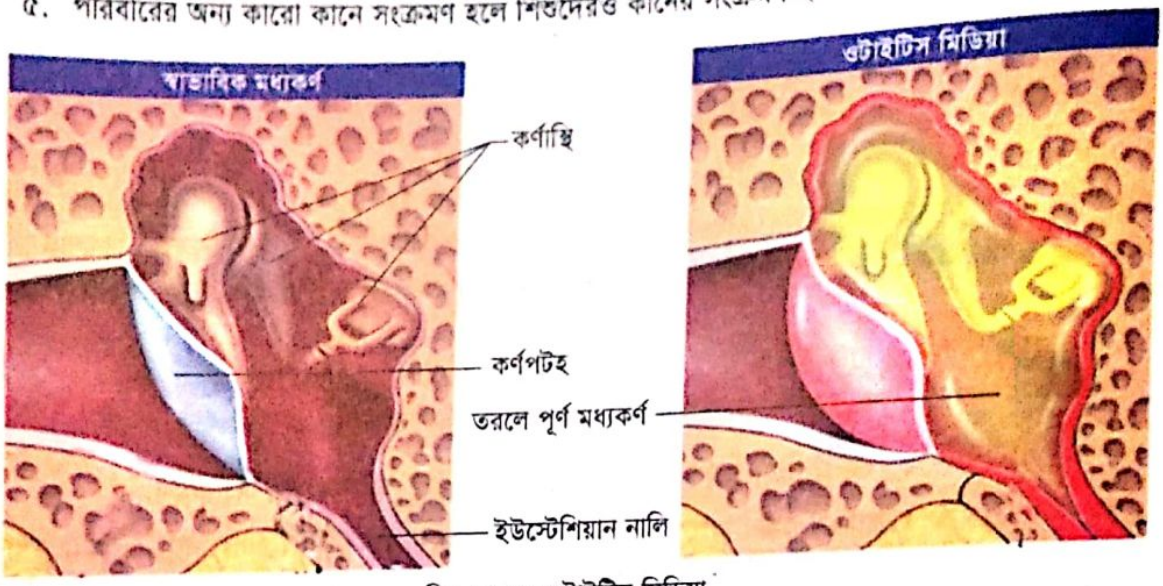

চিত্র ৫.১৫ : ওটাইটিস মিডিয়া

রোগের লক্ষণ

শিশুদের ক্ষেত্রে

১. কানে ব্যথা হয় এবং কান টানতে থাকে।
২. মাথাব্যথা হয় ফলে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে।
৩. দেহে বেশি তাপসহ ($104°F^+$) জ্বর থাকে তাই ঘুমাতে পারে না।
৪. নাক দিয়ে পানি ঝরে, কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হয়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে

১. কানে ব্যথা হয়, কানে চাপ অনুভূত হয় এবং কান ভোঁ ভোঁ করে।
২. মাথা ঝিম ঝিম করে এবং প্রচন্ড মাথাব্যথা হয়।
৩. কাশি হয় ও নাক দিয়ে পানি ঝরে।
৪. কানে কম শোনে, খাবারে রুচি থাকে না।

ওটাইটিস মিডিয়ার জটিলতা

১. কানের পর্দা বা টিমপেনিক পর্দায় ছিদ্র হয়।
২. ছিদ্রপথে মধ্যকর্ণ থেকে গাঢ় তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ে।
৩. কানে কম শোনে।
৪. কানে কম শোনার কারণে শিশুরা সহজে কথা বলা শিখতে পারেনা।

উপদেশ

i. অপ্রয়োজনে কান চুলকানো এড়িয়ে চলা।
ii. ঠান্ডা না নাগানো।
iii. সাতার না কাটা।
iv. কান পরিষ্কার রাখা।
v. কানে পানি ঢুকতে না দেয়া।

CamScanner

প্রতিরোধ (Prevention)

১. শিশুর আশেপাশে ধুমপান না করা। কারণ ধুমপায়ীদের শিশুরা ঠান্ডা ও কানের সংক্রমণে বেশি ভুগে থাকে।

২. কানের সংক্রমণ প্রতিরোধে জন্মের পর শিশুকে অন্তত প্রথম ছয়মাস বুকের দুধ খেতে দেয়া। বুকের দুধে রয়েছে রোগ প্রতিরোধক উপাদান। তা ছাড়া ধারণা করা হয় মায়ের দুধে এমন কোনো উপাদান রয়েছে যা পান করার সময় গলার উপর দিকের মিউকাস পর্দা বা ঝিল্লিতে আটকে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে নিচের দিকে পাকস্থলিতে নিয়ে আসে। ফলে ব্যাকটেরিয়া উপর দিকে ইউস্টেশিয়ান নালিতে প্রবেশের সুযোগ পায় না।

৩. বুকের দুধ বা অন্য কোনো তরল খাওয়ানোর সময় শিশুর মাথাটি পিঠের সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণে উঁচুতে রাখতে হবে। তা না হলে তরল খাবার ইউস্টেশিয়ান নালি হয়ে কানে ঢুকে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।

৪. অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এমন কিছু এড়িয়ে চলা। কারণ অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার কারণে ইউস্টেশিয়ান নালি বন্ধ হয়ে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

৫. গোসলের সময় কানে যাতে পানি প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখা ও বায়ু দূষণ থেকে দূরে থাকা।

৬. বার বার সর্দি হতে থাকলে এবং নাকের ছিদ্রপথ লালাভ রং এর হলে; শিশু মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে এবং রাতে হ্যাঁ করে ঘুমালে শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।

৭. শিশুকালে **নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাক্সিন** (Pneumococcal Conjugate Vaccine) গ্রহণ করে *Streptococcus pneumoniae* সৃষ্ট ওটাইটিস মিডিয়া রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে।

প্রতিকার (Remedy)

১. চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সম্পূর্ণ কোর্সের অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা। প্রয়োজনে কানের ড্রপ এবং **অ্যান্টিহিস্টামিন** জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. অল্প সময়ের জন্য ব্যথানাশক কোন ওষুধ যেমন– **প্যারাসিটামল** জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. সতর্কতার সঙ্গে ২/৩ ফোঁটা উষ্ণ **মিনারেল অয়েল** কানে দেয়া যেতে পারে।

৪. সহনীয় মাত্রায় গরম পানির বোতল চেপে ধরে কানে গরম সেঁক দেয়া। বেশি গরম হলে কাপড়ে বা তোয়ালে পেঁচিয়ে সেঁক দেয়া যেতে পারে।

৫. কান দিয়ে সবসময় পুঁজ পড়ার মতো অবস্থা বার বার ঘটলে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ (ENT Specialist) চিকিৎসকের মাধ্যমে **টিম্পেনোস্টোমি টিউব** (Tympanostomy tube) নামে বিশেষ নলের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

৬. কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে গেলে Myringoplasty করা যেতে পারে।

অধূমপায়ী ও ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রের তুলনা
(Comparison Between the X-Ray Film of the Lungs of Nonsmoker and Smoker)

একটি সিগারেটের শলায় প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক থাকে। ধূমপানের ফলে এগুলো দেহের ভিতরে, বিশেষ করে ফুসফুসে প্রবেশ করে দেহকে অসুস্থ করতে শুরু করে। সিগারেটে যে রাসায়নিক থাকে তার মধ্যে নিকোটিন, আর্সেনিক, মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি প্রধান। একজন অধূমপায়ী যে কাজ চটজলদি করতে পারে, সে কাজ ধূমপায়ীর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ প্রমাণিত হয়। এক্স-রে চিত্রের মাধ্যমে অধূমপায়ী এবং ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা	
অধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে	ধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে
চিত্র ৫.১৬ : অধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্ম	চিত্র ৫.১৭ : ধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্ম
১. ফুসফুস আকৃতিগতভাবে স্বাভাবিক থাকে।	১. সার্বিকভাবে ফুসফুসের আকার বৃদ্ধি পায়।
২. এক্স-রে ফিল্মটি কালো থাকবে, আর ফুসফুসের সকল অঞ্চল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার থাকবে।	২. এক্স-রে ফিল্মটি সম্পূর্ণ কালো হয় না বরং এর সকল অঞ্চলেই বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য ছোপের মতো চিহ্নযুক্ত ঝাপসা অংশ দেখা যায়।
৩. অ্যালভিওলাইয়ের সংখ্যা স্বাভাবিক থাকে এবং এতে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়।	৩. অ্যালভিওলাইয়ের সংখ্যা কমে যায় (নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে) এবং সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না।
৪. অ্যালভিওলাস প্রাচীরের সিলিয়া থাকে স্বাভাবিক।	৪. সিলিয়া বিনষ্ট অবস্থায় দেখা যায়।
৫. এমফাইসেমা-র কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।	৫. এমফাইসেমা হলে তার চিহ্ন দেখা যায়।
৬. ক্যান্সার টিউমারের মতো কোন উপবৃদ্ধি থাকেনা।	৬. ক্যান্সার টিউমার থাকলে এক্স-রে ফিল্মে সেটি ঘন সাদা আঁশের মতো দেখায়।
৭. এক্স-রে ফিল্মে ফুসফুসে পানি জমা (pleural effusion) শনাক্ত করা যায় না।	৭. এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় পানি জমা শনাক্ত করা যায়।
৮. ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া (shadow) স্বাভাবিক ও সমানুপাতিক হয়।	৮. হৃৎপিণ্ডের প্রচ্ছায়া ফুসফুসের তুলনায় ছোট হয়।

ধূমপান এবং শ্বসনতন্ত্রের উপর এর প্রভাব নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো

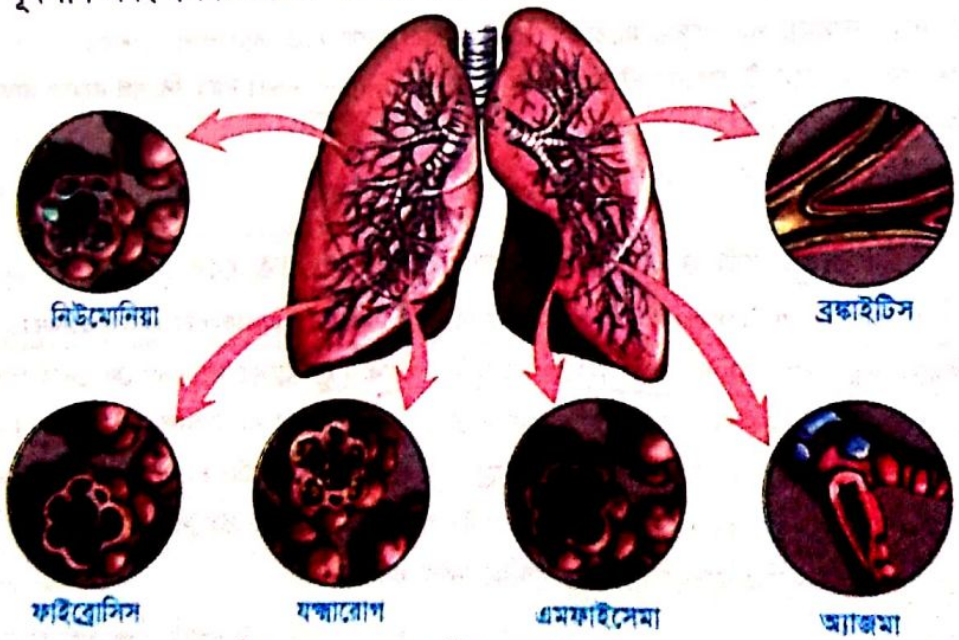

চিত্র ৫.১৮ : ধূমপানজনিত কয়েকটি রোগ

ধূমপানজনিত শ্বসন জটিলতা (Respiratory Complex Due to Smoking)

ধূমপান দু'প্রকার– সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ।

১. **সক্রিয় ধূমপান :** ধূমপায়ী যে অবস্থায় জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি বা চুরুট থেকে নির্গত ধোঁয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে টেনে সরাসরি ফুসফুসে প্রবেশ করায় তাকে **সক্রিয় ধূমপান** বলে । সিগারেটের ধোঁয়াতে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রধান উপাদান **নিকোটিন** । এছাড়া **টার** (tar) ও **কার্বন মনো-অক্সাইডসহ** অন্যান্য ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানও থাকে ।

২. **নিষ্ক্রিয় ধূমপান :** ধূমপানের সময় ধোঁয়ার যে অংশ পার্শ্ববর্তী পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই ধোঁয়া অনৈচ্ছিকভাবে অন্য কোনো ব্যক্তির প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **নিষ্ক্রিয় ধূমপান** বলে । সক্রিয় ধূমপানে ধূমপায়ীর নাক-মুখ দিয়ে নির্গত ধোয়া, জ্বলন্ত সিগারেট, বিড়ি, চুরুট প্রভৃতি থেকে আসা ধোঁয়ার সংমিশ্রনে **নিষ্ক্রিয় ধোঁয়া** তৈরি হয় । এ ধোঁয়াও মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য, বিশেষ করে ফুসফুসের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর । নিচে ধূমপানের কয়েকটি ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

১. **এমফাইসেমা :** সিগারেটের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে অ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোন কোন স্থান ফেটে গিয়ে ফুসফুসে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে । এ অবস্থাকে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে । এ রোগে ফুসফুসের শ্বসন অঞ্চল হ্রাস পায় এবং ফুসফুসের কোষের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় । এতে শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয় ।

২. **ব্রঙ্কাইটিস :** সিগারেটের ধোঁয়ার CO ট্রাকিয়া ও ব্রঙ্কাসের সিলিয়াকে অবশ করে দেয় । সাধারণত সিলিয়া অনবরত দুলতে থাকে । এতে ট্রাকিয়া বা ফুসফুস ধূলাবালি, রোগজীবাণু মুক্ত থাকতে সহায়ক হয় । কিন্তু সিলিয়া অবশ হয়ে গেলে ট্রাকিয়ায় মিউকাস জমে প্রদাহের সৃষ্টি করে । একে **ব্রঙ্কাইটিস** (bronchitis) বলে ।

৩. **যক্ষ্মা :** অত্যধিক ধূমপান যক্ষ্মা হওয়ার অনুকূল অবস্থা তৈরি করে ।

৪. **ফুসফুসের ক্যান্সার :** ফুসফুসের ক্যান্সারের একটি অন্যতম কারণ হলো ধূমপান । তামাকের ধোঁয়ায় বিদ্যমান টার, পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বনস, নাইট্রোসামিনস প্রভৃতি হলো ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান ।

৫. **প্লিউরিসি :** তামাকের নিকোটিনের প্রভাবে ফুসফুসীয় ঝিল্লি (প্লিউরা)-তে প্রদাহের সৃষ্টি হয় । এর ফলে প্লিউরা স্ফীত হয় এবং এর গহ্বরে লসিকা জমে তরল পুঁজের সৃষ্টি করে, ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে । একে **প্লিউরিসি** (pleurisy) বলে ।

৬. **ফাইব্রোসিস :** ফুসফুসের বায়ুথলিগুলোর প্রাচীর স্বাভাবিক অবস্থায় পাতলা থাকে । ধূমপানের ফলে প্রাচীরগুলো পুরু হয়ে যাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে । এর নাম **ফাইব্রোসিস** (fibrosis) ।

৭. **হার্ট অ্যাটাক :** রক্তের হিমোগ্লোবিনে CO শোষিত হয় । এতে রক্তের O_2 পরিবহনের ক্ষমতা কমে যায় । CO ধমনির ভিতরে **কোলেস্টেরল** জমতে সাহায্য করে । ফলে ধমনি গহ্বর সংকীর্ণ হয়ে বা বন্ধ হয়ে O_2 সরবরাহ কমিয়ে দেয় । হৃৎপিণ্ডের ধমনিতে এমন হলে **হার্ট অ্যাটাক** (heart attack) হয় ।

৮. **উদগারি কাশি :** ধূমপানের জন্য অনেকের প্রচণ্ড কাশি এবং কাশির সাথে ফুসফুস থেকে মিউকাস বেরিয়ে আসতে দেখা যায় । একে **উদগারি কাশি** বলে ।

৯. **বুকে ব্যথা ও বমি :** ধূমপায়ীদের অত্যধিক ধূমপানকালে অস্বাভাবিক কাশিজনিত কারণে বুকে ব্যথা দেখা দেয় এবং বমিও করে ফেলে ।

১০. **COVID-19 :** করোনায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ধূমপায়ীদের মৃত্যুর ঝুঁকি অধূমপায়ীদের চেয়ে বেশি । কারণ ধূমপায়ীদের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্থ থাকে ।

ধূমপানের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র উপায় ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করা । আর এ জন্য প্রয়োজন দৃঢ় মনোবলের ।

CamScanner

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Artificial Respiration)

কোনো কারণে, যেমন বৈদ্যুতিক শক-লাগা, অক্সিজেনের অভাব, কার্বন মনোঅক্সাইড-এর বিষক্রিয়া, পানিতে ডোবা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, ঘাড়ে বা মাথায় ইনজুরি ইত্যাদি কারণে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া অথবা হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে এমন জরুরী পরিস্থিতিতে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ বা নাক দিয়ে যান্ত্রিক বা কায়িক ছন্দোময় প্রক্রিয়ায় বাতাস অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে বা বের করে দিয়ে পুনরায় শ্বাসপ্রশ্বাস বা হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক করে তুলে ভুক্তভোগি ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলার নামই **কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস**। বিপদ-আপদ বলে কয়ে আসে না, তাই কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা সবারই জেনে রাখা ভাল। কোনো দুঃসময় বা দুর্গমস্থানে কারও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স বা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলেও আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা অসাধ্য হতে পারে। কিন্তু ঐ সময় যদি সঙ্গী-সাথি কারও কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জানা থাকে তাহলে খুব কম সময়ের মধ্যে সে একটি অমূল্য প্রাণ রক্ষা করতে পারে। তবে এ কাজটি করতে হবে একজন প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে এবং কাজ শুরুর আগে কাউকে বলে রাখতে হবে ডাক্তার বা অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিয়ে রাখতে। কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য CPR (cardiopulmonary resuscitation) বা হৃৎ-ফুসফুসের পুনরুজ্জীবন পদ্ধতি খুব উপযুক্ত। দুর্ঘটনায় কারো শ্বাসপ্রশ্বাস/হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য (Objective of Artificial Respiration)

১. পানিতে ডোবা, বৈদ্যুতিক আঘাত পাওয়া, কার্বন মনোঅক্সাইডের বিষক্রিয়া, মারাত্মক ইনজুরি প্রভৃতি সংকটময় মুহূর্তে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া অতীব জরুরী।

২. দেহে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি হলে বা শ্বাসপ্রশ্বাসের হার অত্যন্ত কমে গেলে দেহে পরিমিত পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে দ্রুত হারে মস্তিষ্কের কোষগুলো নিঃসাড় হতে থাকে। এ অবস্থায় কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস চালনা করলে, তা–

   ক. মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সজীব রাখে ও টিস্যুগুলোকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।

   খ. ফুসফুস ও কৈশিকনালির রক্তের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রে ও হৃৎপিণ্ডে প্রাণশক্তি বজায় রাখে, ফুসফুস স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে।

   গ. ফুসফুসকে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্ফীত ও সঙ্কুচিত করে শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত রাখে। ফলে ফুসফুস তার নিজস্ব স্বাভাবিক সক্রিয়তা লাভ করতে পারে।

৩. সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে বার্ধক্য দশা পর্যন্ত যে কোনো সময় শ্বাসপ্রশ্বাস অস্বাভাবিক হলে বা বাধাগ্রস্ত হলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চালনা জরুরি হয়ে পড়ে।

৪. ভূমিষ্ঠ হবার পরও যে শিশুর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে তাদের জন্য কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া অতীব জরুরি। এরূপ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার পা দু'টোকে চেপে ধরে উপরের দিকে নিয়ে ও মাথাকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পিঠের দিকে একটু হালকা চাপ দেয়া হয়। মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখলে মস্তিষ্কে বেশি রক্ত প্রবাহিত হয় ও তা শ্বাসকেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে। পিঠের দিকে চাপ দিলে প্রতিবর্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক হয়।

৫. বেশি ঠাণ্ডা, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগের জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকমতো চলতে না পারলে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিক হাসপাতালে নেয়া উচিত।

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনের বিভিন্ন পদ্ধতি

১. **মুখে মুখ লাগিয়ে** (mouth to mouth) রোগীর ফুসফুসে বাতাস পরিচালনের জন্য জোরে ফু দিয়ে বাতাস প্রেরণের চেষ্টা করা। সাধারণত প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid) হিসেবে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২. **নাকে মুখ লাগিয়ে** (mouth to nose) ফুসফুসে বাতাস প্রেরণ করা যায়।

৩. **শিশুদের ক্ষেত্রে মুখে ও নাকে** (mouth to mouth and nose-for children) উভয় স্থানে মুখ লাগিয়ে বাতাস প্রেরণ করা।

৪. যদি মুখে মুখ লাগানো সম্ভব না হয় তখন রোগীর মুখে **মুখোশ** (mask) লাগিয়ে সেখানে মুখ দিয়ে জোরে ফু দিয়ে ফুসফুসে বাতাস প্রেরণ করা যায়।

৫. বেলুন জাতীয় ব্যাগ (মুখোশসহ) রোগীর মুখে স্থাপন করে ব্যাগে ছন্দোবদ্ধভাবে চাপ (squezing) দেয়ার মাধ্যমে রোগীর ফুসফুসে বাতাস প্রেরণ।

৬. উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ সম্ভব না হলে সহজে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দেয়ার জন্য বিশেষ ধরনের স্বয়ংক্রিয় **বৈদ্যুতিক যন্ত্র** বা **ভেন্টিলেটর** (mechanical ventilator) ব্যবহার করা যায়।

মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Mouth to Mouth Artificial Respiration)

সময়মত সাহায্য পেলে কিভাবে একটি জীবন বেঁচে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ। পানিতে ডুবে, কোনো কারণে অক্সিজেনের অভাব, বৈদ্যুতিক শক, বিষপান বা গ্যাস গ্রহণ প্রভৃতি নানা কারণে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে কারণেই হোক শিশু বা কিশোরকে (কিংবা পূর্ণবয়স্ককে) বাঁচাতে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে দ্রুত মুখ থেকে মুখে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। এ কারণে প্রথমেই দেখতে হবে বুকের উঠানামা বা কফের লক্ষণ আছে কিনা। না থাকলে ধাপে ধাপে মুখ-মুখে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্যক্রম চালু করতে হবে।

ধাপ-১ : চিৎকার করে কাউকে অ্যাম্বুলেন্স বা ডাক্তার ডাকার অনুরোধ করতে হবে।

ধাপ-২ : বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জিভ সামনের দিকে টেনে দেখতে হবে মুখ-তালু-গলায় কিছু আটকে আছে কিনা, থাকলে আস্তে উপুড় করে আঙ্গুলের সাহায্যে বের করে আনতে হবে। বিশেষ করে বেশি পরিমাণে মিউকাস থাকলে তা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে নিতে হবে।

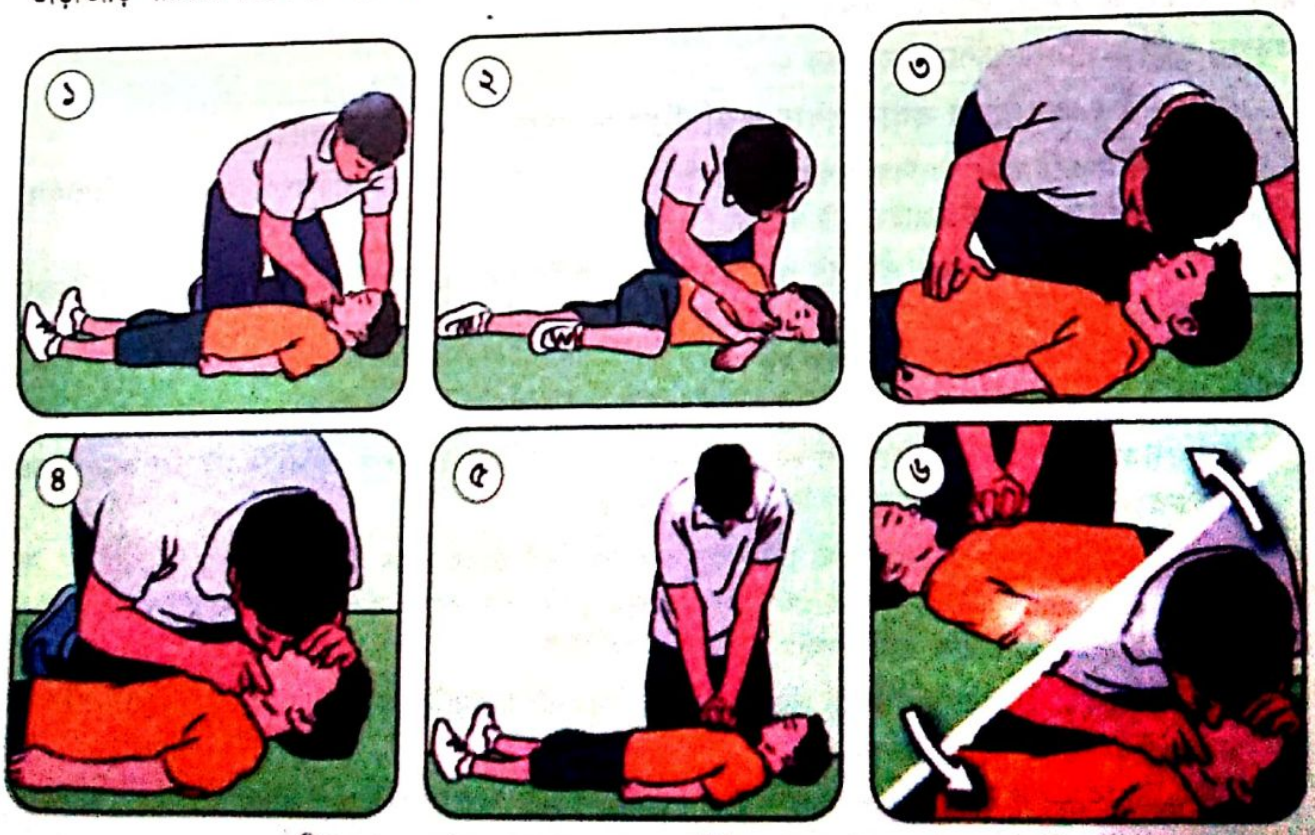

চিত্র ৫.১৯ : মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস

ধাপ–৩ : রোগীকে শক্ত খাট, টেবিল বা মাটিতে চিৎ করে এমনভাবে শুইয়ে দিতে হবে যাতে নাক সোজা ছাদের দিকে বা আকাশের দিকে থাকে। এবার যতখানি খোলা যায় মুখ হা করতে হবে। এতে শ্বাসনালির ভিতর বাতাস ঢুকে সহসা শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হয়ে যেতে পারে।

ধাপ–৪ : শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ দেখা না গেলে মুখ-মুখে শ্বসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ কাজের শুরুতে গভীর শ্বাস নিতে হবে। ছোট শিশু হলে তার নাক-মুখ ঢেকে নিজের মুখ চেপে ধরতে হবে (সামান্য বাতাসও যেন বেরোতে না পারে)। এরপর আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে হবে, লক্ষ রাখতে হবে যেন রোগীর বুক সামান্য ফুলে উঠে। জোরে ফুঁ দেয়া যাবে না, তাহলে শিশুর ফুসফুসের কোথাও ছিঁড়ে যেতে পারে।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে, একহাতে তার নাক চেপে ধরে মুখের উপরে মুখ স্থাপন করতে হবে। তখন সজোরে ফুঁ দিয়ে রোগীর বুক উঁচু হয় তা নিশ্চিত হতে হবে। এভাবে দুবার ফুঁ দিতে হবে।

ধাপ–৫ : ধাপ ৪ চলাকালীন কখনওবা রোগীর হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে পারে। এমন অবস্থায় দুবার প্রশ্বাস দেয়ার পর রোগীর নাড়ি চেপে দেখতে হবে। কনুইয়ের সামনে দু-আঙ্গুলে হালকা চাপ দিয়ে নাড়ির অবস্থা বুঝতে হবে। সামান্য বয়স্কশিশুর ক্ষেত্রে ঘাড়ে শ্বাসনালির পাশে আঙ্গুলের চাপে নাড়ির স্পন্দন একেবারেই না পাওয়া গেলে বুকের মাঝখানে উরঃফলকে চাপ দিয়ে মালিশ করতে হবে।

ধাপ–৬ : ঘটনাস্থলে একাধিক ব্যক্তি থাকলে একজন বুক মালিশ করবে, আরেকজন মুখ-মুখে শ্বাস চালিয়ে যেতে হবে। কম বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে ৩ আঙ্গুল দিয়ে নিপলের ঠিক নিচে চাপ দিয়ে মালিশ করতে হবে। ঘরে যদি আর কেউ না থাকে তাহলে একবার মুখ-মুখে শ্বাস দিয়ে ৫ বার মালিশ করতে হবে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশি চাপের প্রয়োজন হতে পারে, তখন হাতের তালুর গোড়া (palm of hand) ব্যবহার করা যেতে পারে। মালিশের সময় বুক প্রায় দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত চেপে নিচে নামিয়ে দিতে হতে পারে।

রোগীর বুকের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। বুক উঠানামা করতে শুরু করলে মুখে বাতাস প্রবেশ করানো বন্ধ করে দিতে হবে। তা নাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসক, অক্সিজেন নল, অক্সিজেন ব্যাগ, সিলিণ্ডার ও অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. **শ্বসন** এর মাধ্যমে সরল খাদ্যবস্তু অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে খাদ্যস্থিত শক্তি তাপশক্তিরূপে মুক্ত হয় এবং বিপাকীয় বর্জ্য হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি করে।

২. **শ্বসনতন্ত্রের মূল কাজ হলো** পরিবেশ ও রক্তের মধ্যে গ্যাস বিনিময়। প্রশ্বাসের সময় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের অ্যালভিওলাস থেকে এর চারপাশে অবস্থিত রক্তজালকের (blood capillaris) রক্তে প্রবেশ করে এবং **অক্সিহিমোগ্লোবিন** হিসেবে পরিবাহিত হয়।

৩. **ল্যারিংক্স** নাসাগলবিলের পশ্চাতে ও ট্রাকিয়ার অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত পেশি ও নয়টি কোমলাস্থি সমন্বয়ে গঠিত ত্রিকোণাকার ক্ষুদ্র অঙ্গ। ল্যারিংক্স বা **স্বরযন্ত্র** শ্বসনতন্ত্রের অংশ হিসেবে বাতাস পরিবহনে সহায়তা করে। এতে অবস্থিত **ভোকালকর্ডের** সাহায্যে স্বর উৎপন্ন করতে পারে।

৪. **ফুসফুস** দুই স্তরবিশিষ্ট প্লিউরাল পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। দুই স্তরের মাঝে প্লিউলার গহ্বরে **প্লিউলার রস** বা **সেরাস রস** থাকে। এটি ফুসফুসকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে। ফুসফুস সংখ্যায় দুটি। বাম ফুসফুস ছোট ও ২ লোববিশিষ্ট এবং ডান ফুসফুস বড় ও ৩ লোববিশিষ্ট।

৫. মানুষের শ্বসনতন্ত্রে স্বরযন্ত্রের উপরে তরুণাস্থি নির্মিত যে ছোট ঢাকনা থাকে তাকে **এপিগ্লটিস** বলে। এর দ্বারা স্বরযন্ত্রের নির্গমন পথ নিয়ন্ত্রিত হয়।

৬. মানুষের শ্বসনতন্ত্রের ট্রাকিয়া দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে বক্ষগহ্বরে দুটি শাখা সৃষ্টি করে। এদের ক্রোমনালি বা **ব্রঙ্কাই** (একবচনে-bronchus) বলে। দুটি ব্রঙ্কাই দুই ফুসফুসে প্রবেশ করে।

CamScanner

৭. প্রাইমারি ব্রঙ্কাস থেকে শুরু করে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ গঠনচিত্র দেখতে অনেকটা উল্টানো বৃক্ষের মতো বলে একে **শ্বসন বৃক্ষ** বা **ব্রাঙ্কিয়াল বৃক্ষ** বলে।

৮. গলবিলের নিচের অংশের ঠিক সামনের দিকে থাকে **স্বরযন্ত্র**। এটি টুকরো টুকরো তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড কার্টিলেজ সবচেয়ে বড় এবং এটি গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে। হাত দিলে এর অবস্থান বোঝা যায় এবং বাইরে থেকে দেখা যায়, যাকে **অ্যাডামস অ্যাপল** বা **কণ্ঠমনি** বলে।

৯. নাসা গহ্বরদ্বয় যে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় তাকে **কোয়ানি** (choanae) বা **পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র** বলে।

১০. প্রতিটি ফুসফুসের যে স্থান দিয়ে ব্রঙ্কাস, রক্তনালি ও লসিকানালি প্রবেশ করে তাকে **হাইলাম** (hilum) বলে।

১১. প্রতিবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে ঢুকে কিংবা ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে **টাইডাল ভলিউম** বা **বায়ুমাত্রা** বলে।

১২. ফুসফুসের সর্বমোট বায়ুধারণ ক্ষমতাকে **ভাইটাল ক্যাপাসিটি** বা **বায়ুধারণ ক্ষমতা** বলে।

১৩. লোহিত রক্তকণিকা থেকে যতটি HCO^-_3 রক্তরসে আসে ততটি Cl^- রক্তরস থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। একে **ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া** বা **হ্যামবার্জার বিক্রিয়া** বলে।

১৪. **অ্যালভিওলাই** ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যকরী একক। প্রতিটি অ্যালভিওলাস ক্ষুদ্র বুদবুদ সদৃশ বায়ুকুঠুরি বিশেষ। অ্যালভিওলাইয়ের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস O_2 এবং CO_2 এর বিনিময় ঘটে। মানুষের দুটি ফুসফুসে ৪৮০ মিলিয়নের অধিক অ্যালভিওলাই থাকে।

১৫. অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে বিশেষ ধরনের কোষ থাকে যারা প্রাচীরের ভিতরের দিকে **সারফেকটেন্ট** নামক ডিটারজেন্ট জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত করে। এ পদার্থ অ্যালভিওলাসের স্ফীতি অবস্থা বজায় রেখে গ্যাস বিনিময় সহজ করে। এছাড়াও এটি অ্যালভিওলাসে আগত রোগজীবাণু ধ্বংস করে।

১৬. রক্তের যে অংশ দ্বারা শ্বসন গ্যাস বিশেষ করে O_2 পরিবাহিত হয় তাকে **শ্বাসরঞ্জক** বলে। মানুষের লোহিত কণিকায় বিদ্যমান লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী ভারী পদার্থ **হিমোগ্লোবিনই** হলো **শ্বাসরঞ্জক**। আয়রন ও প্রোটিন নিয়ে হিমোগ্লোবিন গঠিত।

১৭. **হিমোগ্লোবিন** একটি শ্বাসরঞ্জক বা অক্সিজেন বাহক গ্লোবিউলার প্রোটিন, যা লোহিত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমে থাকে। অক্সিজেনপূর্ণ পরিবেশ থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে অক্সিজেনরিক্ত পরিবেশে সরবরাহ করার জন্য হিমোগ্লোবিনকে **রবিন হুড অণু** বলা হয়।

১৮. ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ এবং ফুসফুস থেকে বায়ু নির্গমন প্রক্রিয়াকে **পালমোনারি ভেন্টিলেশন** বলে। একে সাধারণভাবে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস বা শ্বাসকার্য বলে।

১৯. শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী **রেসপিরেটরী সেন্টার** মস্তিষ্কের মেডুলায় অবস্থিত।

২০. উর্ধ্ব শ্বসননালির সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাইনুসাইটিস, ওটাইটিস মিডিয়া। **সাইনুসাইটিস**-এ ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে অথবা অ্যালার্জিজনিত কারণে প্যারান্যাসাল সাইনাসস্থিত মিউকাস পর্দায় প্রদাহ সৃষ্টি হয়। টিমপেনিক পর্দা ও অন্তঃকর্ণের মাঝে অর্থাৎ মধ্যকর্ণের সংক্রমণকে **ওটাইটিস মিডিয়া** বলে।

২১. শ্বাসনালিতে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বস্তু প্রবেশের ফলে কষ্টদায়ক শ্বাসগ্রহণ ও তারও অধিক কষ্টদায়ক শ্বাসত্যাগ এর ঘটনা ঘটলে তাকে **হাঁপানি** বলে।

২২. শ্বাসনালি সরু ও ফুসফুসে অতি স্ফীতি সৃষ্টিজনিত অস্বাভাবিকতা এবং প্রদাহকে **এমফাইসেমা** বলে।

২৩. COPD এর পূর্ণরূপ Chronic Obstructive Pulmonary Disease। দীর্ঘস্থায়ী ধূমপায়ীদের ফুসফুসে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এতে শ্লেষ্মা নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে বেশি বেশি শ্লেষ্মা তৈরি করে ও কাশি হয়।

২৪. দূষিত ধূলিকণা আর্দ্র বাতাসের সাথে শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে শব্দসহ কাশি ও ক্লেশদায়ক কষ্ট সৃষ্টি করে। একে **ব্রঙ্কাইটিস** বলে।

২৫. নিজ চেষ্টায় শ্বাস গ্রহণে সক্ষম না হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনের ব্যবস্থা করা হয়। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনের জন্য পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো **মুখে মুখ লাগিয়ে রোগীর ফুসফুসে বাতাস প্রেরণ**। সাধারণত প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

CamScanner